বেগম

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়



ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

প্রকাশকাল : অগ্রহায়ণ ১৩৬৫

প্রকাশক : মলয়েন্দ্রকুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক : ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট,
কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদ শিল্পী : অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : নিউ প্রাইমা প্রেস

॥ দাম : তিন টাকা ॥

প্রিয়বন্ধু

প্রাণতোষ ঘটক

করকমলেষু—

এই লেখকের :

মৃগতৃষ্ণা

মাথুর

পঙ্কজা

মধুমতী

রাতভোর

রাগিণী

মৌনবসন্ত

রঙ্গরাগ

চন্দনডাঙ্গার হাট

॥ বেগম ॥

টানাটানা চোখের বাদামী মধ্যমণি জ্বলে ওঠে। চোখের কোণ রক্তাভ হয়ে ওঠে দেখতে দেখতে। গালে আগুনের আভা যেন। কমলার কোয়ার মত টসটসে ঠোঁটদুটো কাঁপতে থাকে! গরম নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ওঠানামা গোনা যায়। নাকের পাতাদুটি ফুলে ফুলে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত মার খেতে হ'ল স্বামীর কাছে? মার খেয়ে কাঁদতে হবে আর চুপ করে সইতে হবে? বেগম সে মেয়ে নয়।

বনপতিপুরের বীরবল তালুকদারের মেয়ে সে। তালুকদার কেন জমিদারই বলা যেত। সড়কি আর রামদা' চালাতে বীরবলের জুড়ি ছিল না। চোখের সামনে একটা চাকরকে একটা কোঁতকাতেই মেরে ফেলেছিল বীরবল। পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে পুঁতে ফেলেছিল। কাকপক্ষী টের পায়নি। দেখেশুনে ওরা হাসত। এমন ত' হামেশাই হয়ে থাকে। তারা মেরেই এসেছে। মার খেতে জানেনি কখনও।

আজ যে তালুকের ছিঁটেফোঁটাও নেই, তবু বীরবল তালুক-দারকে ভয় করেনা এমন মানুষ তার বাপের বাড়ীতে একটাও নেই।

তাই মার খেয়ে কাঁদবার শিক্ষা ওরা পায়নি। কাঁদতে জানেনা বেগম। কাঁদাতেই জানে। আজও বেগম কাঁদল না।

ওর নরম ফরসা সুপুষ্ট দেহখানি তপ্ত নরম ইস্পাতের মত রক্তাভ হয়ে উঠল। আগুন ধরে গেল সর্বশরীরে।

হঠাৎ যেন অতি ঘৃণিত সামান্য জীব বলে মনে হ'ল নিরঞ্জনকে। বেগমের গায়ে হাত তুলে পৃথিবীতে নিরঞ্জন এখনও যে বেঁচে আছে এইটেই ওর কাছে পরম বিস্ময় বলে মনে হ'ল।

ছোটবেলায় আর একবার ওর এইরকম মনে হয়েছিল। ছেলে-টাকে আজও ওর মনে আছে। মঙ্গলার মায়ের ভাইপো। কালো রোগা। হাত পায়ের গাঁটগুলো ছিল অস্বাভাবিক মোটা। চোখ-ছুটো লালচে হয়ে থাকত প্রায় সবসময়। ওর বয়েস তখন কতই বা হবে। বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়েছে। গড়নটা ওর বাড়বাড়ন্ত বরাবরই। ওই বয়সেই ওর সুপুষ্ট পাছুটোর ওপর সাড়ী টানতে হ'ল। ফ্রক পরলে অনাবৃত পায়ের গড়নটা বেমানান লাগছিল। তাতে বেগমের কিছু লজ্জা ছিল না। কিন্তু ওর মা সেটা বরদাস্ত করলেন না। সাড়ী পরবার হুকুম দিলেন।

এই সময়েই মঙ্গলার মায়ের ভাইপো ছু একদিন ওকে ডেকে-ছিল। একদিন সকালে ডাকল।

হাসিমুখে একটা পেয়ারা চিবোতে চিবোতে যাচ্ছিল বেগম। ডাক শুনে এগিয়ে এলো—কিরে? রোজ রোজ অমন ডাকিস কেন?

সবাইকেই তুই বলা অভ্যেস বেগমের। বলবেই বা না কেন? কোন্ ছেলেকেই বা গ্রাহ্য করে ও! তাছাড়া তালুকদারের মেয়ে এ তল্লাটে মান দিয়ে কথা বলবে আবার কাকে?

ছেলেটা তোত্‌লা হয়ে গেল,—এই ফু-ফু-ফুলটা নিবি?

একটা লাল গোলাপ ওর হাতে দেয়।

মন্দ লাগে না বেগমের। রক্তের মত লাল গোলাপ ওর যেন পছন্দ।

গোলাপটা নিয়ে লুফ্‌তে লুফ্‌তে চলে যায়।

দিনকয়েক পরে সন্ধ্যে লাগবার মুখে কাঁঠাল গাছতলায় ছেলে-টাকে দেখে বেগম। তখনও একেবারে অন্ধকার হয়নি। গাছের পাতার আড়ালে অন্ধকারটা ওই জায়গাটায় যেন জমাট বেঁধে আছে।

ছেলেটা ডাকল।

বেগম বিকেলে পুকুরে নেমে সাঁতার কেটেছিল অনেকক্ষণ। ছেলেটাকে পুকুরের ধারেও দু'একবার দেখেছিল। বেগমের দিকে তাকিয়েছিল। ও অবশ্য গ্রাহ্য করেনি।

ভিজে সাড়ীটা গায়ে লেপ্‌টে আছে। সপ্‌ সপ্‌ শব্দ করে চলছিল বেগম।

—শোন।

বেগম থমকে দাঁড়াল। কে ডাকছে অন্ধকারে? যেই ডাকুক, ভয় কাকে বলে বেগম জানে না। এগিয়ে গেল।

ছেলেটা ওর কাছে এলো।

তাকাল একবার।

—কি বলছিস্‌?

—বলছিলুম কি আমি তোকে ফুল দিলুম—।

—হ্যাঁ, তাতে কি? নাচব?

ছেলেটা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

—তুই আমায় কি দিবি?

—ছাই দেব। কচু দেব। খাবি? হেসে ওঠে বেগম। ঘুরে দাঁড়ায়।

ছেলেটা তখন মরিয়া। জান্‌ যায় কি থাকে। খপ্‌ করে বেগমের হাতটা ধরে টানল।

বেগমের সর্বশরীর জ্বলে উঠল। চোখের বাদামী মধ্যমণি জ্বলে উঠল অন্ধকারে।

হঠাৎ ছেলেটাকে ইঁদুর বেড়ালের মত একটা ঘৃণিত জীব বলে মনে হ'ল।

পাশে পড়েছিল একখানা পাথর। তুলে নিয়ে মেরে দিল ছেলেটার মাথায়।

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল।

ছেলেটার কালো মুখখানা দেখতে দেখতে লাল হয়ে গেল।

লাল রক্তমাখা মুখটা দেখে বেগমের ভীষণ হাসি পেল। আনন্দ হ'ল খুব।

পড়ে গেল ছেলেটা মাটিতে।

বেগম ফিরল। ওর হাতে রক্ত লেগেছে। হাতের রক্তটা দেখতে দেখতে ও চলল আবার পুকুর ধারে। হাতে ঘসতে লাগল রক্ত।

রক্তটা দেখতে দেখতে প্রায় নাচতে নাচতে চলল বেগম। বুকটা তার ভরে উঠল অনাস্বাদিত খুসিতে।

ভারি মজা লাগল।

পুকুরে গিয়ে আর একবার স্নান করে বাড়ী ফিরে এলো।

ফেরবার মুখে সেই কাঁঠাল গাছটার নীচ দিয়ে আসবার সময় ছেলেটাকে আর দেখল না। বাড়ীতে এসে শুনল ঝিয়ের কাছে, মঙ্গলার মায়ের ভাইপোটা কাঁঠাল তলায় পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে প্রায় আধমরা হয়ে গেছে। স্টেশানের ওপারে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। সেদিন রাত্রে খুব তৃপ্তি করে মাংসের ঝোল আর ভাত খেল বেগম। সবচেয়ে ভাল ঘুম হয়েছিল ওর সেদিন রাত্রে।

•

আজ আবার তেমনি ওর চোখের বাদামী মধ্যমণি জ্বলে উঠেছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে নিরঞ্জন মুখটা নীচু করে।

আজকের রাত্রের ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়। অনেকদিনের জমাট এক কালোস্রোত নেমে এসেছে হঠাৎ দু'জনের মনে।

বেগম আজ ফিরেছিল রাত প্রায় সাড়ে দশটায়।

রাঁধুনির কাছে দু'বার খোঁজ করে বেগমকে পায়নি নিরঞ্জন। শরীরটা আজ ভাল ছিল না। জ্বর জ্বর লাগছিল। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল, তবু ছাত্র ক'টিকে বাইরের ঘরে পড়িয়ে ভেতরে এসে শুয়ে পড়ল। রাত বাড়ল, বেগম তখনও ফেরেনি।

নিজের হাতে চুলগুলো টানতে লাগল নিরঞ্জন। তবু মাথার

যন্ত্রণা কমল না। বেড়েই চলল। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে নিরঞ্জনের। আর সওয়া যায় না। এমন এক স্বাধিকার প্রমত্তা মেয়ের সঙ্গে জীবনের প্রতিটি দিন রাত্রি কাটান এখন প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তবু একটুও শব্দ করল না নিরঞ্জন। চুপ করে শুয়ে রইল। আজীবন চুপ করে থাকা অভ্যাস করেছে, কিন্তু আজ কিছু বলা দরকার। এর আগেও বহুবার বুঝিয়েছে বেগমকে জীবনের অনেক তত্ব। বেগম হেসেছে খিল খিল করে। চুপ করে গেছে নিরঞ্জন। জীবনের গভীরতাকে কখনও মাপল না বেগম, ওপরের তরঙ্গ গুণে গুণেই কাটাল। তরঙ্গের আনন্দে উচ্ছ্বলতা ওর বেড়েই চলেছে। অসহ্য! এর চেয়ে বেগমের মৃত্যু হোক।

বেগম এলো। রাত তখন প্রায় এগারোটা। নিরঞ্জন শুয়ে ছিল। বেগম ঘরে ঢুকে দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে সটান শুয়ে পড়ল নিরঞ্জনের পাশে। খিল খিল করে হাসতে স্মরু করল।

নিরঞ্জন কথা বলেনি একটাও। চুপ করেই শুয়ে রইল।

—ডাক্তারটাও প্রায় পাগল হবার জোগাড়। হ্যাঁগো, আমার ভেতর কি দেখে, যে ওরা পাগল হয়?

যৌবন গর্বিত চোখে একবার নিজেই দেখে নিলে নিজের দেহটা। দেহের প্রতিটি কণায় কণায় যৌবনের উন্মত্ততা প্রকাশ পাচ্ছে!

নিরঞ্জন খুব আস্তে বলে—কোথায় ছিলে?

—ডাক্তারের ওখানে।

—ডাক্তারকে পাগল করে আর লাভ কি?

—ক্ষতিই বা কি? হোক না পাগল?—খিল খিল করে হেসে ওঠে।

নিরঞ্জন হাসে—তুমি ত জান তুমি একদিন মরবে।

—ওসব জানলেও ভাবি না।

—তখন এই দেহটাকে কাঠের তলায় পোড়াতে হবে।

একটু যেন চমকে ওঠে বেগম। তক্ষুনী কথাটাকে হাল্কা করে হেসে বলে—আমার এ দেহ আমি পোড়াতে দেব না। বলে যাব—

--তোমার বলে যাওয়ার ওপর সবই নির্ভর করবে না। পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

বেগম উঠে বসে—কি তুমি সব যা তা' বলছ।

নিরঞ্জনও উঠে বসে—কতবার তোমাকে বলেছি তোমার রূপ যৌবনের অহঙ্কারটা যে কত ভুয়ো তুমি জান না। তাছাড়া আমি তোমার স্বামী।

—হ্যাঁ। তাতে কি!

—আমাকে এতটা অগ্রাহ্য করা তোমার ঠিক নয়।

বেগম উঠে দাঁড়ায়—জীবনে কাউকে কখনও গ্রাহ্য করিনি। তাছাড়া তুমি আমাকে যেটুকু পাও, সেটাই তোমার বাপের ভাগ্যি।

নিরঞ্জন ধমকে ওঠে—চুপ কর। আমার বাবা ছিলেন সাধু পুরুষ। তাঁর কথা তুমি কখনও উচ্চারণ করো না।

বেগমের নাকের পাতাদুটি ফুলে ওঠে।

নিরঞ্জন বলে—আর একদিনও তোমার এরকম বেরোন হবে না।

—তোমার হুকুম?—বেগমের কথায় শ্লেষ।

—হ্যাঁ। আমার হুকুম।

বেগমের কানদুটো গরম হয়ে যায়। বাঁকা হেসে বলে—এত আস্পর্ধা! তুমি কি জান, তোমায় আমি মানুষ বলেই ভাবি না? পোষা পাঁঠা ভেঁড়ার মত মনে করি।

নিরঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে আর কথা বলে না। একটা চড় বসিয়ে দেয় ওর গালে।

বেগমের বাদামী মণি জ্বলে ওঠে। লোকটার এত স্পর্ধা! বেগমকে ও চেনে না। বীরবল তালুকদারের জাঁহাবাজ মেয়ে! বাবার বলিষ্ঠ মুখখানা মনের ওপর ভেসে ওঠে ওর।

সর্বশরীর গলা ইস্পাতের মত গরম হয়ে ওঠে।

ও দেখাবে। ও প্রতিজ্ঞা করে মনে মনে। ও দেখাবে। নিরঞ্জনকে পাঁঠার মতই টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে। ও যে নিরঞ্জনকে পাঁঠার চেয়ে বেশী কিছু মনে করে না, সেটা প্রমাণ করবে।

তারপর? তারপর ভাববার কি দরকার? এখনও ওর বাপ বীরবল তালুকদার বেঁচে আছে। একটা খুন হজম করে ফেলবার ক্ষমতা তার বাবার এখনও আছে। বেগম কাঁপতে থাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

নিরঞ্জন একটু সময় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এপারে বর্ধমান জেলা আর ওপারে নদীয়া জেলা। মাঝে বয়ে গেছে গঙ্গা। হুগলীর গঙ্গা এখানে অনেক ক্ষীণকায়া। গরমে দু'পাড়ে ঢালাও বালির চড়া পড়ে। মধ্যে বয়ে যায় তিরতির করে সাদা চিকচিকে জলের রেখা। জল বেশী শুকোলে হেঁটে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু বর্ষায় এখানকার গঙ্গায় ঘোলা আসে। এদেশের মানুষ বলে, ঘোলা এসেছে।

ঘোলা এসেছে মানে আষাঢ়ের মাঝামাঝি সময় গেরুয়া রঙের জলের তোড়ে দু'কুল ছাপিয়ে যায়। তেমন তেমন বর্ষা নামলে গায়ের সীমানা পেরিয়ে এগিয়ে আসে গঙ্গার ঘোলা জলের স্রোত। লালচে গেরুয়া রঙের জলের স্রোতে তখন কি ভীষণ টান! স্নান

করতে ভয় হয়। তবু বেগম এই গঙ্গার দুরন্ত স্রোতেও অনেকটা এগিয়ে যেত সাঁতার কেটে। ছোটবেলা থেকেই।

এ পারে বর্ধমান জেলার এই বর্ধিষ্ণু গাঁয়েই মানুষ হয়েছে বেগম। বর্ষার গঙ্গার মত দুরন্ত স্বভাব ওর আশৈশব। যৌবন যখন ওর এলো, দু'কুল ছাপিয়ে এলো। ফুলে ফেঁপে। সেই ভীষণ যৌবনের স্রোতে কত কি যে তলিয়ে গেল হিসেব রাখে নি বেগম। গঙ্গার মত তরঙ্গে তরঙ্গে নেচে নেচে চলাটাই ওর স্বভাব হয়ে গেছে। গঙ্গার ভাঁটা আছে। বেগমের ভাঁটা নেই। জোয়ারের বিরাম নেই ওর প্রাণচাঞ্চল্যে। ওকে পার হয়ে যাওয়া প্রায় অসাধ্য। এত উজানে পাড়ি দিতে বুকের পাঁজরা ভেঙে যাবে। ভেঙে গেছেও অনেক পুরুষের। ডুবে তলিয়ে গেছে। ডোবেনি নিরঞ্জন। আরও একজন। সে সদানন্দ। লিচুর শাঁসের মত নিস্তেজ চোখদুটো মেলে শুধু তাকিয়েই থেকেছে। ডোবেনি। ভাসেও নি।

তালুকদারের সংসারে এখনও বনেদী ভাবখানা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। ঝি চাকর ছাড়াও ঠাকুর পূজোর বাঁধা পুরুত, মালি, লেঠেল এমন কি ছেলেদের জন্য বাড়ীতে পোষা মাষ্টারও থাকত।

সেই সময়ে পোষা মাষ্টার ছিল সদানন্দ। চেহারাটি বলিষ্ঠ বিশাল। সূর্য না উঠতে সদানন্দ উঠত। বাগানে গিয়ে আড়াইশ' বৈঠক আর পঁচাশী ডন, তাছাড়া আরও নানা ধরনের ব্যায়াম করে ঘেমে এসে বসত বাইরের ঘরে। ওর কালো পাথরের মত ঠাণ্ডা বিশাল পেশীবহুল শরীরখানা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত তখন। কিন্তু মুখখানা ছিল দেহ আন্দাজে ছোট। আর চোখদুটো ছিল নিস্তেজ সাদা।

বেগম বলত—মোষের মত।

বলতে বলতে ঝিলিক দিত বেগমের চোখে।

সদানন্দর বয়েসটা ছিল খুবই কম। আঠারো উনিশ। আর

বেগম তখন কুড়ির ওপর। বেগমের বিয়ে হয়েছে বাইশে। এখন একত্রিশ।

বিয়ে কেন দেরীতে হ'ল সে কথা পরে হবে। ছোটবেলা থেকেই ওর ধাতটা ছিল ভারি কড়া আর জেদী। তালুকদার নিজের পৌরুষ শক্তি আর জেদের পুরোপুরি ছায়া দেখতে পেতেন এই মেয়ের ভেতর। তাই বোধ হয় ভালও বাসতেন খুব। তালুকদারের আদরে বেগম ক্রমে দুর্দমনীয়া হয়ে উঠল। দুঃসাহসিকাও বটে। তালুকদার দেখতেন আর হাসতেন। তাঁর মেয়ে বলে পরিচয় দেবার মত মেয়ে হয়েছে বেগম। ধবধবে রঙ, সুগঠিত দেহ আর তেমনি চঞ্চল। তালুকদার দেখতেন তাকিয়ে তাকিয়ে।

নালিশ আসত প্রায় রোজই। বদ্যিদের মেজ ছেলেটাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল। তখন ত বেগমের বয়েস মোটে আট।

একটা বাখারির ছড়ি হাতে নিয়ে বলল—তুই ঘোড়া হ' আমি তোর ওপর চড়ব।

ছেলেটা একটু শান্ত। একটু নিরীহ।

বেগমকে ভাল করে চেনে। বলল—না ভাই। তুমি মারবে।

বেগম টুকটুকে ঠোঁটদুটো বেঁকিয়ে বলল—আমাকে ঘাড়ে নিয়ে না চলতে পারলে মারব না ত' কি দানা দেব?

ছেলেটা কিছুতেই রাজী নয়।

বেগমও ছাড়বে না। বাখারির ঘা কসাল দুটো।

ছেলেটা অগত্যা ঘোড়া হ'ল। কিন্তু একটু যেতে না যেতেই হুমড়ী খেয়ে পড়ল।

—ওরে বাবা! কি ভারী তুমি?

বেগম নাছোড়। কিছুতেই ছাড়বে না। ছেলেটা পালিয়ে বাঁচল।

কিন্তু বাঁচল না। পরদিন ওরা গিয়েছিল গঙ্গায় স্নান করতে।

বেগম বলল—আমি কুমীর হই। তুই আমার ওপর চড়ে বসবি আয়।

ছেলেটা এবারেও একটু আপত্তি জানাল।

—এবারে ত' আমি জলে থাকব। তুই ওপরে।

ছেলেটা ভাবল মন্দ কি, তাই হোক তবে।

বেগম ওকে কাঁধে নিয়ে একটু বেশী জলে গিয়ে ফেলে দিল। ফেলে ঘাড়টা ধরে ওর ওপর চেপে রইল।

জলের তলায় হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছেলেটার তখন প্রাণ যায়।

বেশ কয়েক মিনিট জলের তলায় চেপে রেখে ওকে যখন ছেড়ে দিল বেগম ; ছেলেটার তখন প্রায় শেষ অবস্থা। জল খেয়ে পেট ফুলে গেছে। চোখদুটো টকটকে লাল, প্রায় বেরিয়ে এসেছে ঠেলে। ধরাধরি করে টেনে তুলল সবাই।

বেগম মুখ লুকিয়ে বেদম হেসে নিল খানিকটা।

নালিশ এল তালুকদারের কাছে।

তালুকদার বললেন—নিশ্চয়ই বড় বেয়াদপ হয়েছে মেয়েটা। শাসন দরকার।

ডাকলেন বেগমকে।

বেগম এসেই পিঠের ওপর চড়ে বাবার গলাটা জড়িয়ে ধরল।

—হ্যাঁরে তুই বদ্যিদের ছেলেকে জলে চেপে ধরেছিলি ?

—হ্যাঁ।

তালুকদার একটু শাসনের ভঙ্গীতে বললেন—কেন ? যদি মরে যেত ?

—ও কেন ঘোড়া হ'ল না ?

তাও ত' বটে। তালুকদার মাথা চুলকোলেন। তবে ত' একটা কারণ রয়েছে। ও কেন ঘোড়া হ'ল না। ঠিকই বলেছে বেগম।

বেগম যখন ঘোড়া হতে বলেছে, তখন ঘোড়া না হয়েও বেঁচে থাকবার অধিকার এ গাঁয়ের কোন ছেলের থাকতে পারে কিনা, এইটেই বিচার করতে সুরু করলেন তালুকদার। শাসন করা আর হ'ল না।

শুনে বেগমের মা বললেন,—ছ্যা! ছ্যা! এ কেমনধারা মদ্দা-মাগী গো! তোর জ্বালায় কি আমার গাঁয়ে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না? আর তেমনি হয়েছে মেয়ের বাপ। আদরে আদরে গোল্লায় দিলে মেয়েটাকে! নিজে যেমন ছিলেন, তেমনি তৈরী কচ্ছেন মেয়েকে। গুণ্ডার কন্যে গুণ্ডা হয়ে উঠছে। হাড় জ্বলে গেল আমার।

বলতে বলতে ওর মায়ের রোগা ফ্যাকাসে মুখখানা রাগে দুঃখে লাল হয়ে ওঠে।

চিররুগ্না বেগমের মায়ের ওপর তালুকদারের অত্যাচার কম যায়নি। ভীতু নিরীহ মহিলাটি নীরবে সহ্য করেছেন দুর্দান্ত স্বামীর অত্যাচারের আবদার।

বড় গুলির মত এক ডেলা মোদক আর গোটা চব্বিশেক রসগোল্লা খেয়ে রাতের পর রাত বেগমের মাকে নানা হুকুম করেছেন তালুকদার। হুকুম তামিল করতে না পেরে ঘুমে চোখ ঢুলে এলে শুধু চড়চাপড়ই নয়, চোখে সরষের তেল ঢেলে দিয়েছেন তালুকদার। এমনি নিদারুণ প্রমোদ রজনীগুলোর দুর্বিষহ স্মৃতির পাষান ভারী হয়ে আছে বেগমের মায়ের বুকে।

দুটো ছেলে হয়ে মরে যাবার পর, তৃতীয় বেগম। তারপর আরও দুটো ছেলে।

—ও মেয়ে অমন হবে না ত' হবে কে? আমি আর বেশী দিন বাঁচব না, কিন্তু বলে যাচ্ছি ও মেয়ে খুনে হবে। বাপের হাড় জ্বালাবে।

বলত বেগমের মা।

ক্রমে তালুকদারের বয়েস হয়ে এলো। বেগম বড় হয়ে উঠল। পরের ভাই দুটোও। বেগমের মায়ের বেশীর ভাগ সময় কাটতে লাগল ঠাকুর ঘরে। সকালে ঠাকুরঘরে ঢুকলে বেরোতে বেরোতে অনেক বেলা হ'ত বেগমের মায়ের। সন্ধ্যে বেলাও তাই।

বেগম হাসত—মায়ের বোধ হয় মাথা খারাপ হয়েছে। আমরা ত' ভূতই মানিনে তার আবার ভগবান!

তালুকদার হাসত।

—মা-টা যেন কেমন ধারা বাবা!

তালুকদার তামাক টানতে টানতে বলত—তোর মা চিরকালই এমনি ধারা। টুস্‌কি মারলে মুচ্ছা যায়। জীবনটা আমার নষ্ট করে দিয়েছে।

একটা দার্শনিক হাই তোলবার চেষ্টা করে তালুকদার।

এক মাংসলোভী বাঘের বুড়ো বয়সে হাড় চিবোতে না পারার জন্যে দার্শনিক হাইয়ের মত। বেগমের হাতখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকেন তালুকদার। বেগমের হাতের হাড় খুব মোটা চওড়া। বেশ ভারী হাত। বেগমকে তাই এত ভাল লাগে তালুকদারের। বেশ জোয়ান মেয়ে। বাপের মত।

বেগমের ভাই দুটো কিন্তু তেমন হয়নি। একটা অবিকল মায়ের ধারা পেয়েছে। ওই রুগ্ন ঠাণ্ডা আর নম্র। একটা রসগোল্লা একবারে খেতে পারে না। ভেঙ্গে ভেঙ্গে খায়। দু'চোখে দেখতে পারে না তালুকদার ছেলেটাকে।

—বেরো সামনে থেকে!

বাপের গর্জনে প্রায় কেঁপে ওঠে ছেলেটা।

ঠাকুরঘরে চলে আসে। ঠাকুরঘরের দোরের সামনে বসে বসে মায়ের পূজো দেখে। দেখতে পায় স্তব পাঠ করতে করতে চোখের জলে মায়ের গাল দুটো ভেসে যায়।

দেখতে দেখতে ছেলেটারও কেন যেন কান্না পায়। বসে বসে হয়ত বা কাঁদে।

পূজো শেষ হলে বেগমের মা পেছন ফিরে দেখতে পায় ওকে। ওর হাতে প্রসাদ দেয়। কাপড় ছেড়ে বাইরে এসে ওকে কাছে টেনে নেয়।

—কি হ'লরে? কাঁদছিস কেন?

—তুমি কাঁদছিলে কেন মা?

বেগমের মায়ের চোখে আবার জল আসে ধীরে ধীরে। ওকে জড়িয়ে ধরে বলে—আমার অনেক দুঃখু বাবা। তাই ঠাকুরকে জানাই।

—তোমার কি দুঃখু মা?

—আছে। তুই বুঝবিনে। অনেক আছে।

ছেলেটা মায়ের কোলে মুখ গুঁজে চুপ করে থাকে। শিশুমনের চারধারে ভাবনার কুয়াশা জমে। মায়ের কি কষ্ট আর কোথায় বেদনা? আবিষ্কার করবার ব্যর্থ চেষ্টায় চুপ করে থাকে ছেলেটা।

দু' ভাই ওরা, খোকন আর মনু। খোকন ভয়ানক দুরন্ত। বেগম ওকে সহ্য করতে পারে না। খোকনও সহ্য করতে পারে না বোনকে। ওদের ঝগড়া প্রায় লেগেই থাকে। দুজনেই ভীষন দুরন্ত। মনুটা বেশ ঠাণ্ডা। বেগমের স্বভাবের সঙ্গে মনুর স্বভাবের বিন্দুমাত্র মিল নেই। তবু কেন যে বেগমের মনুকে ভাল লাগে ও বোঝে না।

গাছ থেকে পেয়ারা আর কুল পেড়ে নিয়ে এসে মনুকে ও ভাগ দেয়।

—নে যা। এতবড় হলি। এখনও গাছে উঠতে শিখলিনি।

—গাছে উঠতে আমার ভয় করে দিদি। তোর ভয় করে না?

বেগম হাসে—ভয়? ধ্যুস্! তুই একটা রামভীতু। তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। চ' পুকুরে সাঁতার কাটবি?

—না ? ভয় করে।

—তবে আমার গামছা জামা নিয়ে ঘাটে দাঁড়াবি চ'।

খুব জোরে একটা চুমু খেয়ে ভাইকে নিয়ে ও পুকুর ধারে যায়।

বাবা যখন মনুকে বকেন, বেগম প্রতিবাদ করতে ছাড়ে না। মনুর ওপর ওর বড্ড বেশী স্নেহ। দুর্বলের ওপর মায়া।

মনু হয়ত বাইরের ঘরের দাওয়ায় পেটটা চেপে বসে কাঁদছে।

তালুকদার এলেন।

—কিরে ? এখানে বসে কাঁদছিস কেন ?

মনু বাবার মুখের দিকে তাকায়।

—পেট কামড়াচ্ছে।

জ্বলে ওঠেন তালুকদার। তার ছেলে বলে কিনা পেট কামড়াচ্ছে। জীবনে পেট কামড়ান কাকে বলে তালুকদার আজও জানেন না।

ধমকে বলেন—তা' বসে বসে কাঁদলে সারবে হারামজাদা ? যা কবরেজ মশায়ের কাছে যা।

বেগম পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। শোনে কথাগুলো।

বলে—তুমি ওকে মিছিমিছি কেন বকছ বাবা ? একে ওর পেট ব্যথা। হ্যাঁরে, আজ বুঝি কাঁচা লিচু অনেকগুলো খেয়েছিলি ? আয়, আমার সঙ্গে আয়, কবরেজ মশায়ের কাছে চ'।

ছোট ভাইকে হাত ধরে কবরেজ মশায়ের ঘরের দিকে নিয়ে চলে যায় বেগম। হাত দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দেয়।

উঠোনে ওর মায়ের সঙ্গে দেখা। লাল পেড়ে গরদের সাড়ী পড়ে উনি যাচ্ছিলেন ভাগবত পাঠ শুনতে নারায়ণ বাড়ীর আটচালায়। পরশু পদ্মপুরানের পাতালখণ্ড শেষ হয়েছে। আজ থেকে ভাগবত আরম্ভ। পাতালখণ্ডে সামান্য কিছু বৃন্দাবন লীলা শুনেই চোখের জল সামলাতে পারেন নি। এক অনির্বচনীয় আনন্দে চোখ জলে ভরে উঠেছে অনেকবার। গোঁসাইজীর মুখখানি তারপর থেকে যতবারই মনে হয়েছে, ততবারই বেগমের মায়ের বুকে

এক পরম শান্তির ঠাণ্ডা ছায়া পড়েছে। অর্জ্জুনের গোপীবেশে লীলাদর্শনের কাহিনী বলতে বলতে গোঁসাইজীর ফরসা দেহখানি কেঁপে কেঁপে উঠেছে।

চোখ ছুটো গোলাপী হয়ে জলে ভরে উঠেছে।

বেগমের মা চোখের জল মুছেছেন কেবলই।

আজ উনি ভাবছিলেন সমস্তদিনই। ভাগবত পাঠের সময় গোঁসাইজীর রূপটি কল্পনা করছিলেন। সবকাজের ভেতরেও কেমন একটা আনন্দ লাগছিল।

হঠাৎ মনুকে কাঁদতে দেখে যাবার পথে বাধা পেয়ে বড় খারাপ লাগল।

—কি হয়েছেরে ?

উত্তর দেয় বেগম তড়বড় ক'রে—পেট কামড়াচ্ছে। আর কি হবে ?

মনু মাকে দেখে আরও কাঁদে—বাবা বকেছে।

বেগমের মায়ের মেজাজটা মুহূর্তে চড়ে যায়। সহ্যেরও সীমা আছে ? তাঁর নাগাল না পেয়ে ছেলেটাকে যখন তখন যে তালুকদার তাড়না করেন, এটা মোটেই ভাল লাগে না। একটু সময় চুপ করে থেকে বলেন—তোর বাবা কোথায় ?

বেগম উত্তর দেয়—বাবা বোধ হয় ভেতর বাড়ীতেই আছে।

মনুর হাত ধরে বেগমের মা ভেতর বাড়ীর দিকে চলে আসে।

তালুকদার ঘরে একটা শীতল পাটির ওপর বসে সিন্দুক খুলে কতকগুলো কাগজপত্র দেখছিলেন। বেশীর ভাগই সুদের কাগজ।

—ওকে বকেছ কেন শুনি ?

বেগমের মায়ের দিকে তাকান তালুকদার। প্রথমটা একটু থমকে গেলেও পরমুহূর্তে নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে বলেন—আমার খুসী।

বেগমের মায়ের অতিদুর্বল গলাটাও একটু জোরাল শোনায়—খুসী ত' তোমার একার নয়, আমার ও ত' খুসী থাকতে পারে।

তালুকদার চোখ বড় বড় করে তাকান।

বলেন—হিসেবের সময় গোলমাল কোরনা।

বেগমের মা বলেন—হিসেবটা আজ আমিও মিটিয়ে ফেলতে চাই।

তালুকদার আবার চোখ বড় বড় করে তাকান।

—একটা কথা তোমাকে স্পষ্ট জানান দরকার।—বেগমের মায়ের গলা কাঁপছে।

তালুকদারের ভ্রূ দুটো কুঁচকে যায়—কি ?

—তোমার সঙ্গে থাকা আমার আর সম্ভব হবে না।

—সম্ভব না হলেও তোমার থাকতে হবে।

—না, আমার ব্যবস্থা আমি করে ফেলেছি।

—কি শুনি ?

—ওই নারায়ণ বাড়ী আটচালার ধারে গোঁসাইজী একখানি ঘর আমায় দেবেন। মনুকে নিয়ে আমি সেখানেই থাকব।

তালুকদার স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—মনু আর আমি দুজনেই তোমার চক্ষুশূল। আমাদের এখান থেকে বিদেয় হতেই হবে।

—আমি যদি না যেতে দিই।

—তুমি আটকাতে পারবে না। তাছাড়া—

—তাছাড়া আমি ভাবছি দীক্ষা নেব।

—তাতে আমার আপত্তি নেই। আমাদের গুরুকে খবর দিই।

—না। আমি গোঁসাইজীর কাছেই দীক্ষা নেব।

তালুকদারের মুখটা লাল হয়ে যায়,—তা হয় না। আমরা ঘোর শাক্ত। আমাদের বৈষ্ণব দীক্ষা চলবে না।

—কেন চলবে না ?

—ও সব হরেকেষ্ট ফেষ্ট এখানে চলবে না।

—যা তা বোল না বলছি।—বেগমের মায়ের গলা কাঁপে।

—বেশ করব বলব। বেশী বাড়াবাড়ি কোর না। গোঁসাইজীকে একদিন ধরে এনে তোমার সামনে মার দেব। পরের বউঝিকে টাল মারা তার জন্মের মত বার করে দেব।

বেগমের মায়ের চোখ ফেটে জল বেরোয়—খবদ্দার তুমি একজন সাধুকে অপমান কোর না।

বাইরে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেগম বাপ মায়ের কথা সবই শুনছিল। ওর বেশ আনন্দ লাগে।

তালুকদার উঠে দাঁড়ান—আর তুই কি কচ্ছিস্? শাক্তের মাগ হয়ে বোষ্টমের ঘরে যাবার মতলব কচ্ছিস। তোকে ঘরে আটকে রাখব তিনদিন, না খাইয়ে। বেশী রাগাসনি আমায়।

বেগমের মা চিৎকার করে বলেন—জানোয়ারের সঙ্গে ঘর করে আজীবন জ্বলে গেলুম। আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাব। এক্ষুনি যাব।

বেগমের মা দরজার দিকে ফিরতেই তালুকদার নিদারুণ রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ওর কাঁকালে একটা ভীষণ রকমের চড় বসিয়ে ঠেলে ফেলে দেন।

বেগমের মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

মনু চীৎকার করে ওঠে।

বেগম বাইরে দাঁড়িয়ে উত্তেজনার আনন্দে অস্থির হয়ে ওঠে।

মনুর হাত ধরে টেনে ঘর থেকে বার করে ঘরে শিকল তুলে দেন তালুকদার।

—খবর্দার। এ ঘর যে খুলবে। আমার হাতে খুন হবে সে।

চেঁচিয়ে বলতে বলতে বেরিয়ে যান তালুকদার।

ভাবতে বেগমের ভারী ভাল লাগে। এত ভাল লাগে বাবাকে! বাবা যদি চাবুক এনে মারত! আরও আনন্দ হ'ত! এই বয়েস

থেকেই বীভৎসতার খুসীতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল বেগম। বীভৎস-ভাবে আসুরিক শক্তি চালনা ওর জীবনে এক রোমাঞ্চকর আনন্দের সূচনা করছিল। ছোট বেলা থেকে বাবা ওর মনে দুর্দান্ত শক্তিমান নায়কের মত গভীর রেখাপাত করেছিল। হিংসা আর ঈর্ষার জঘন্যতম দৃশ্যগুলোই ওকে সবচেয়ে বেশী আনন্দ দিত। চাবুক মারতে মারতে একটা লোককে অজ্ঞান করে ফেলতেও দেখেছে। ভয়াল উত্তেজনার আনন্দে অধীর হয়ে পড়েছে।

তারপর বাবাকে দেখেছে দারোগাবাবুকে নেমন্তন্ন করে পোলাও মাংস খাওয়াতে। আর সেই লোকটাকেই বেঁধে থানায় নিয়ে যেতে।

এমন সব ভীষণ অন্যায় সংসারে হয়। শুধু হয় না, যে করে সেই এ সংসারে বীর। নায়ক। এই ধারণাই ধীরে ধীরে ওর সব মনটাকে গ্রাস করে ফেলেছিল।

তাই বেগম উপভোগ করল বাবা মায়ের এই ঘটনাটি।

কিছুদূরেই ওদের কুলগুরু বাস করতেন। সেখানে লোক পাঠান হ'ল। কুলগুরুকে আনান হ'ল। তালুকদার গুরুকে দেখাতে চান যে শাক্তকে অপমান করলে তিনি নিজের স্ত্রীকেও ছেড়ে কথা বলেন না।

রুদ্রাক্ষের মালা গলায়। কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, তার ভেতরে সিঁদুরের ফোঁটা। মানুষটি এমনিতে বেশ শান্ত। তৈলাক্ত বড় বড় চুল পরিপাটি করে আঁচড়ান। জটা নেই।

চোখ আরক্তিম। সর্বদাই ভিজে ভিজে।

তিনি এলেন। বেগম ভাবল, এবার বোধহয় আরও গুরুতর কিছু হবে। গুরু যখন এসেছেন; গুরুতর কিছু না হয়ে আর যায় না।

গুরুকে পা ধুইয়ে প্রণাম করলেন তালুকদার।

পায়ের কাছে রাখলেন পাঁচটা রূপোর টাকা।

গুরু আশীর্বাদ করলেন। একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন—মা তারা! মাগো!

স্বরটা সুমিষ্ট। আন্তরিক।

একগাল হাসলেন ছেলে মানুষের মত।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন—খবর সব কুশল?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তালুকদার উঠে দাঁড়ালেন নীরবে।

বেলা হলে গুরুর খাওয়া শেষ হলে প্রসাদ গ্রহণ করবার আগেই তালুকদার ডাকলেন গুরুকে।

—যে জন্যে আপনাকে খবর দিয়েছিলাম। এখন সেইটে বলব।

—বলো।—রুদ্রাক্ষের মালা হাতে নিয়ে বললেন হেসে। সামনে গোটা তিনেক দাঁত না থাকাতে খুব ছেলেমানুষের মত দেখায় ওঁকে।

তালুকদার বললেন ঘটনাটি। শেষে বললেন—এত বড় স্পর্ধা! ঘোর শাক্ত বংশ আমরা! আর উনি কিনা এক গোঁসাইয়ের ঘরে বাসা বাধবেন, আমাদের গুরুর অপমান!

গুরু কিন্তু এতটুকুও উত্তেজিত হলেন না এতে।

গম্ভীর মুখে বললেন—গুরুতত্ব বড় কঠিন! মা তারা!

তালুকদার বললেন—ওকে যে মেরে ফেলিনি এই ওর ভাগ্য।

গুরু একটু হাসলেন—কে কাকে মারতে পারে বাবা। বৌমা কোথায়?

তালুকদার ওঁকে নিয়ে ঘরের সামনে এলেন। শিকল খুললেন তালুকদার। ভেতরে ঢুকলেন ওঁরা।

গুরু বেগমের মায়ের কাছে গিয়ে ডাকলেন—মা!

ডাকটি বড় মধুর।

বেগমের মা ওখান থেকেই উপুড় হয়ে প্রণাম করে তাকালেন।

কপালে জমাট রক্তের দাগ।

—একি ! রক্ত কিসের ?

তালুকদার বলেন—ওকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম। তাই হয়ত লেগেছে।

গুরু তালুকদারের দিকে তাকালেন, হঠাৎ খুব বেশী গম্ভীর হয়ে তালুকদারের পিঠে হাত রেখে বললেন—খুব অন্যায় করেছ বাবা। তুমি মায়ের গায়ে হাত তুলেছ !

—কিন্তু তাই বলে শাক্ত হয়ে বোষ্টমকে···

একগাল হেসে ফেলেন গুরুদেব—আরে বাপু সবই ত' এক। আমার মা-ই ত' কৃষ্ণ বিষ্ণু সব। এ ত' মায়েরই এক একটি রূপ। যে পরম বৈষ্ণব, সে ত' আমার মায়েরই পরম ভক্ত। শোন, তুমি খুব অন্যায় করেছ। তুমি বৌমার কাছে ক্ষমা চাও।

তালুকদারের পছন্দ হয় না কথাগুলো। চুপ করে থাকে।

বেগমের মায়ের হাত ধরে ওঠান গুরুদেব—ওঠ মা। প্রসাদ পাওগে।

বলে তালুকদারের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলেন—তাহলে আমি এখন চলি বাবা ?

বোঝা যায় যে তিনি এখানে আর বেশীক্ষণ থাকতে চাইছেন না।

তালুকদার কথা বলেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যান।

বেগমও বড়ই নিরাশ হয়। গুরুটা তেমন সুবিধের না। ঠিক জমল না। দুটো হুংকার দেবেন, দুটো অভিশাপ দেবেন। তবে ত' ইয়ে হ'ত। সব ভেস্তে দিয়ে গেল এই গুরুটা। তবে বেগম লক্ষ্য করল যে এর পর থেকেই বেগমের মা শয্যাশায়িনী হলেন। এই আঘাতটা বোধহয় ঠিক সইতে পারলেন না।

পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। যা খান তাই বমি হয়ে যায়। সমস্ত রাত জেগে কি সব জপ করেন। কারো সঙ্গে একটা কথাও বলেন না।



এর ভেতরেই একদিন মনুকে নিয়ে নারায়ণ বাড়ীর আটচালায় গিয়েছিলেন বেগমের মা। তখনও গোঁসাইজী পাঠে বসেন নি। শ্বেত চন্দনের রসকলি আর তিলক ধারণ করছিলেন। বেগমের মা সব বলেছিলেন। সব ঘটনা। কিছুই বাদ দেননি।

শুনে গোঁসাইজী হাসলেন।

—তোমার স্বামী হয়ত ঠিক বোঝেননি মা। আমাদের শ্রীরাধারাণীই ত' আদ্যাশক্তি। আমরাও ত' মায়েরই ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ কি শ্যামা হননি ?

বেগমের মা দীক্ষার অনুরোধ করেছিলেন।

গোঁসাই অনেকক্ষন চিন্তা করে বললেন—স্বামীর অমতে দীক্ষা গ্রহণ ঠিক নয়।

বেগমের মায়ের বুকটা কেঁপে উঠল।

মিষ্টি হেসে বললেন গোঁসাইজী—মনে কষ্ট কোর না মা। আমি আশীর্বাদ করছি। শ্রীরাধা রাণী তোমাকে কৃপা করবেন। কোন দুঃখ কোর না। তোমাদের কৃপা না করলে আর কৃপা করবেন কাকে ?

বেগমের মা চোখে জল নিয়ে বললেন—তাহলে আমি কি করব ?

—দিনরাত নাম করো। নামই কৃপা এনে দেবেন।

ওই উপদেশই দীক্ষা বলে মেনে নিয়ে শুয়ে শুয়ে দিনরাত বেগমের মা জপ করেন। কথা বলে একটু সময় নষ্ট করতেও আর বেগমের মা রাজী নয়। ওই সাধনই শেষ সাধন বলে মেনে নিলেন বেগমের মা।

এরপর বেগমের মা আর বেশীদিন বাঁচেননি। এ জন্মটা বেগমের মায়ের এই ভাবে এক গভীর রাত্রে এক মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল।

পাশে কেউ ছিল না। কেউ জানলও না।

জানল সবাই পরদিন ভোরে। বাড়ীতে হৈ চৈ পড়ে গেল।

তালুকদার এলেন। গুম্ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বাইরের ঘরে চলে গেলেন দাহের বন্দোবস্ত করতে।

তালুকদার কাঁদলেন না একটুও।

বেগম রুক্ষ্ম চুলে ঘুরে বেড়াল। ওর বাদামী চোখত্নটো একটু স্তিমিত মনে হ'ল মাত্র। এতক্ষণ বেগমও কাঁদেনি।

মুষ্কিল হ'ল মনুকে নিয়ে। মনু কিছুতেই ছাড়বে না মায়ের দেহটাকে। আছাড় খেয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

বেগম এসে ধরল ওকে। মনুর কান্না দেখে ও তখন কেঁদে ফেলল।

জ্ঞান হবার পর এই বোধকরি প্রথম বেগমের কান্না।

আরও চারটে সুদীর্ঘ বছর কেটে গেল। বেগমের বয়েস হ'ল। বিয়ের বয়েসও পেরিয়ে গেল প্রায়। কিন্তু বিয়ে আর কিছুতেই হয় না। বেগম সে জন্যে একটুও ভেঙে পড়েনি। বিয়ে হলেই দড়ির বাঁধন। এ বেশ এখানে ওখানে ঘুরে নেচে বেড়ান যাচ্ছে। খুসীতে উপচে পড়ছে সবসময়ই।

তাছাড়া পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে বেগমের।

কমলার কোয়ার মত নীচের ঠোঁটটা দাঁতে কামড়ে ধরে বাদামী চোখ বেকিয়ে ও যদি কোন ছেলের দিকে তাকায়, তার হৃদপিণ্ড তখন ত্রিতালে চলতে থাকে।

দেখে হাসিতে ভেঙে পড়ে বেগম। পুরুষগুলো কত করুণ জীব! এগুলোকে করুণা করতে ইচ্ছে হয়। সুতরাং কাউকে ভ্রূক্ষেপ করা প্রয়োজন মনে করে না বেগম। আগুনের মত জ্বলন্ত রূপ নিয়ে আলো করে থাকে এ অঞ্চলটা।

যে ছেলেটার রোঁয়া রোঁয়া গোঁফ উঠেছে সে বেগমকে চেনে না, এমন হতেই পারে না। বেগমের জন্যে জীবন দিতে পারে, এমন ছেলের সংখ্যাও কম নয়।

কোঁদপুরের কাঠের কারবারীর একমাত্র ছেলে খুতু এসেছিল বেড়াতে এধারে। বেগমকে দেখে তার ঘুম বন্ধ হয়ে গেছে।

চোখ বুঁজলেই দেখতে পায় বেগমের চোখদুটো ধারাল ছুরির মত ঝিকমিক করছে। ঘুমবে কি, বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে।

খুতু বলল—মেয়েটা কে রে?

এ অঞ্চলে 'ড্রামাটিক ক্লাবে' সব চেয়ে বেশী চাঁদা দেয় খুতু। সবাই বলে খুতুদা বা খুদ্দা। বলল নন্তু—ওকে চেনো না খুদ্দা? বেগম। তালুকদারের মেয়ে। ওরে বাপ!

—ওরে বাপ মানে?

—মানে 'ডেঞ্জারাস্'। লাথি মেরে একটা খাটাসকে আধমরা করে দিল, এমনি পায়ের গোছের জোর। আর ওই বিশেকে? বলনা অমিয়

অমিয় বলল—বিশে, আমাদের বিশ্বনাথ, ওকে বোধহয় একটু ইয়ে করেছিল। মানে শীষ দিয়েছিল। ব্যাস্ সটান এসে বিশের চাঁদির চুল চেপে ধরলে। সে যদি দেখতে খুদ্দা!

খুতু মজা পায়—তাপ্পর?

অমিয় বললে—আমরা সব হাওয়া। গা ঢাকা দিয়ে দেখি বেগমের হাতে একগোছা চুল। বিশের টেকোতে চুল নেই। বিশে তড়পাচ্ছে। বেগম হাসছে। সে কি হাসি রে বাবা!

খুতু বলল—তাপ্পর?

অমিয় বলল—তারপর আর কি। বিশের বাবা গেল বেগমের বাবার কাছে। তালুকদার বলল, নিশ্চয়ই বিশের চুলে খুস্‌কি ছিল। চুলের গোড়া আলগা ছিল। নইলে চুলের গোছা চেপে ধরল আর উঠে এলো! এ কখনও হয়!

খুতু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল—বিশের মাথায় চুল গজাল?

—তা গজিয়েছে! কিন্তু কি ইয়ে বলোত! সেই থেকে বিশেকে দেখলেই বেগম হেসে গড়িয়ে পড়ে।

নন্তু বলল—বললুম না, ডেঞ্জারাস্! তবে দেখতে কিন্তু···

অমিয় নন্তুকে টেপে—চুপমার। খুদ্দার সামনে কি হচ্ছে ?

খুদু একটু গম্ভীর থেকে বললে—আমি হলে···

—কি করতে খুদ্দা ?

—ওকে পাঁজকোলা করে বাড়ী এনে নাপিত দিয়ে ন্যাড়া করে দিতুম।

—মাইরী বলছ !—নন্তু খুব হাসে—তুমিও খুব ডেঞ্জারাস্।

খুদু আর কোন কথা না বলে চলে গেল।

খুদু ছাড়েনি। পরদিনই বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে বেগমের সামনা সামনি এগিয়ে এসে তাকাল বেগমের দিকে।

ফরসা মোটাসোটা ছেলে খুদু।

—দুধেভাতে ছেলেটা ত' মন্দ নয় !—মনে মনে ভাবল বেগম।

খুদু এগিয়ে এলো।

—একটা কথা ছিল !

বেগম তাকাল। কথা যে কি বেগম জানে। সকলেরই এক কথা।

তবু প্রথমটায় একথা সেকথা বলবে—তাও বেগম জানে।

—কি ?

—আমাকে বোধহয় চেন না। কোঁদপুর থেকে এইচি। নাটক করতে এখানে। তা বলছিলুম কি ; তোমার বাবার কিন্তু চাঁদাটা বেশী দিতে হবে।

'তুমি' সম্বোধন শুনেই বেগমের মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। বলল—তা বাবার কাছে যাও না। আমার কাছে কেন ?

বেগমের 'তুমি' সম্বোধন শুনে খুদু ভরসা পেল।

—না, মানে, তুমি বললে তোমার বাবা কথা ফেলতে পারবে না।

বেগমের ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে—তোমার বাবা কত দিচ্ছে?

ওর ধনুকের মত ভ্রূ দেখে খুদু একটু ঘাবড়ায়।

—আমার বাবা? মানে, আমিই ত' দিচ্ছি পঞ্চাশ টাকা। তবে না হয় তুমি দাও।

বেগম মুহূর্ত কাল একটু কি ভাবে। ওর বাদামী চোখের তারা দুটোয় এক অব্যক্ত ইসারা এনে তাকায় খুদুর দিকে। অকারণে একটু হাসে।

একটু জড়িয়ে জড়িয়ে বলে—আমি দেব? বেশ।

বড় বড় চোখ দুটো স্তিমিত করে তাকায়। ফিক্ করে হেসে বলে—একটা কথা শুনবে?

খুদুর বুকটা এই বারে যেন কাঁপছে।

খুদুর ফুলো ফুলো গাল দুটো একটু লালচে দেখায়।

কাঁপা গলায় বলে - কি?

—একটা কাজ করবে আমার? তারপর তুমি যা বলবে···

বলে আবার ফিক্ করে হাসে।

খুদুর অবস্থা তখন নিদারুণ ভাবে শোচনীয়।

—বলো। কি কাজ?—বলতে গিয়ে গলায় আটকে যায় কথা।

বেগম বলে—এই যে গাছের গুঁড়িটা রয়েছে? এটা ঘাটের ধারে নিয়ে যেতে হবে আমার। কি করে নিই বলো ত'?

—তাতে কি? খুদু ঢোঁক গেলে—আমি নিয়ে যেতে পারব।

—পারবে?

—খুউব।

বলে খুদু মালকোঁচা মেরে গুঁড়িটার কাছে যায়। খুব ভারী। তা হোক। ওকে নিতেই হবে। গুঁড়িটা তুলতে মুখচোখ রাঙা হয়ে ওঠে। তবুও মুখে বলে—এ আর কি, এত হালকা!

বলে গুঁড়িটা নিয়ে এগোয়।

বেগম পেছন পেছন চলে—ওই যে বাঁ ধারে পুকুর।

ফরসা মোটা খুতু গুঁড়িটা কাঁধে চলেছে। শিরদাড়াটা বেঁকে গেছে।

বেগম মুখে আঁচল চাপা দেয় হাসির বেগ থামাতে।

—আহা কষ্ট হচ্ছে !

খুতুকে বলতে হয়—না, কষ্ট আর কি

ঘাটের ধারে আসে খুতু। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পাখীর কলরব শোনা যাচ্ছে চারধারে।

খুতু আনতে পেরেছে গুঁড়িটা। খুব খুশী খুতু।

—কোথায় নামাব।—ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে বলে খুতু।

—এইখানে।—বলে বেগম আস্তে পেছন থেকে ধাক্কা মারে খুতুকে।

ব্যস্! খুতু গুঁড়ি শুদ্ধু একেবারে পুকুরের জলে।

তারপর শুধু বেগমের খিল খিল হাসি শোনা যায়। বেগম নেই।

নন্তু অমিয় ওরা খুতুকে খুঁজছিল। স্টেজ বাঁধা হবে আজ সন্ধ্যায়। খুদ্দা গেল কোথায় ?

—এ ধার পানেই ত' এলো।

—ও খুদ্দা !—চেঁচাচ্ছে নন্তু।

পুকুর থেকে কোনমতে খুতু উঠতে পেরেছে। হাঁপাচ্ছে তখনও।

—খুদ্দা। কোথা গেল বলত ? ও খুদ্দা !

—এই যে আমি।—খুতু এতক্ষণে সাড়া দেয়।

নন্তু অমিয় ওরা এগিয়ে আসে। খুতুও মোটা শরীরটা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে আসে।

খুতুদার অবস্থা দেখে ওদের চক্ষু স্থির।

—একি ! সব ভিজে যে !

খুতু একটু ফ্যাকাশে হাসি হাসে—আর বলিস নি। মুখ ধুতে গিয়ে···একবারে ইয়ে···মানে এমন পিছল তোদের ঘাট ? একবারে যাচ্ছে তাই !

নন্তু সায় দেয়—তা বটে। তায় আবার বর্ষা চলছে।

—চল কাপড় জামাটা ছেড়ে নিই।

—চল। তোমার জন্যে সব বসে আছে।

খুতু হঠাৎ চটে যায়, বসে আছে! বসে আছে ত' মাথা কিনে নয়েছে! আমার এদিকে একবারে ইয়ে যে···

চলতে চলতে বলে—চাঁদা আদায় হ'ল? ওই তালুকদার মানে মেয়েটার বাপ কত দিলে?

—তুমি ত' যাবে বললে ওখানে?

—আমি? খেপিছিস! ওই রদ্দি মেয়েটা থাকতে···তোদের বেগম মেয়েটা কিন্তু একবারে রাস্‌কেল!

নন্তু বলে—বললুম না। ডেঞ্জারাস।

ওরা বাড়ী চলে আসে।

বেগম বাড়ী গিয়ে ঘরের মেঝে শুয়ে পড়ে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে প্রায় পেটে খিল ধরে যায়। মোট্‌কা খুতুর চেহারা মনে পড়ে আর হাসি পায়। গুঁড়িটা নিয়ে যখন চলছিল খুতু, ঠিক মোটাসোটা একটা গরুর মত মনে হচ্ছিল বেগমের।

মনু ঘরে ঢোকে।

বেগম আবার হেসে ওঠে।

—হাসছিস কেন দিদি?

উত্তরে আরও দ্বিগুণ হাসতে থাকে বেগম।

—কি হ'লরে? হাসছিস কেন?

—একটা মোট্‌কাকে—। বলতে গিয়ে আবার হাসি।

—দিদি, বাবা বলছিল···

বেগমের হাসির বেগ কমে।

—তোকে কাল বিকেলে দেখতে আসবে।

—কে? কেন?

—তোর বিয়ের জন্যে।

—ধুস্। বিয়ে আমি করব না।

—কিন্তু বাবা যে বলছিল।

—বলুকগে। তুই বাবাকে বলে দিস।

—ওরে বাবা, আমি বলতে পারব না।

—বেশ। আমিই বলব। বিয়ে করবে, না হাতী করবে!

মনু কি একটু ভেবে বলে—আমিও বিয়ে করব না দিদি।

—তুই বড় হয়ে বিয়ে করবি।

—না। বড় হয়েও না।

—কেন রে?

—আমার ও সব ভাল লাগে না।

—কি ভাল লাগে তোর?

মনু বলে—কাউকে বলবি না বল?

মাথা নাড়ে বেগম। মনু এসে কানে কানে বলে—ঠাকুর ঘরে থাকতে ভাল লাগে।

বেগমের মুখে বিরক্তি আসে।

—দুর! তুই কিরে। একটুকু বয়েস থেকে ঠাকুর-ঠাকুর। আমি ও সব মানি না। সব বাজে।

মনুর মুখটা শুকিয়ে যায়—না দিদি বাজে নয়। তুই জানিস না।

—আমি বলছি সব বাজে।

মনুর মুখখানা বেদনায় ম্লান হয়ে যায়—ওই জন্যে তোকে আমার মাঝে মাঝে ভাল লাগে না। বলতে বলতে বেরিয়ে যায় মনু।

বেগম চুপ করে বসে একটু ভাবে—মনুটা যে দিন দিন কি হচ্ছে। ঠিক মায়ের মত। ওর জন্যে মাঝে মাঝে ভাবনা হয় বেগমের।

আবার খুড়ুর কথা মনে পড়তেই হাসিতে ফেটে পড়ে।

ইদানীং তালুকদার বেগমের বিয়ের চেষ্টা করছিলেন। মেয়ে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠেছে। তিনি যতই আদর দিন না কেন মেয়েকে, ওর নামে কিছু কথা তালুকদারের কানে আসে। একে রূপসী তার ওপর ডানপিটে। পাঁচটা কথা হওয়া আশ্চর্য্য কিছু নয়। অনেক ভেবে চিন্তে ওর বিয়ের জন্যে চেষ্টা করতে উঠে পড়ে লেগেছেন তালুকদার।

দু একটা সম্বন্ধ কানাঘুঁষো কথা শুনেই ভেঙে গেছে। মেয়ের সুনাম নেই। কাজেই বিয়ে দিতে যে বেগ পেতে হবে, এটা ক্রমে বুঝতে-পাচ্ছেন তালুকদার।

পরদিন বিকেলে কলকাতার দু'জন ভদ্রলোক দেখতে আসবেন বেগমকে। সম্বন্ধটা একটু গোপনে রেখে শিগ্‌গির পাকা করে ফেলতে চান তালুকদার।

বেগমের মা নেই। তালুকদারকে নিজেরই বলতে হয়—আজ বিকেলে কোথাও বেরোস নি।

—কেন বাবা? বেগম বড় বড় চোখ তুলে তাকায়।

—দরকার আছে।

—কি দরকার বলো না?

তালুকদার একটু বিরক্ত হলেও বলেন—দুটি ভদ্রলোক আসবে। তোকে দেখবে।

—দেখবে কেন বাবা?

আবার বিরক্ত হন তালুকদার। একটু গম্ভীর হয়ে বলেন—তোমায় বিয়ে দিতে হবে ত'? তাই।

বেগম একটু চুপ করে থাকে।

তারপর চোখদুটো তুলে বাবার দিকে তাকিয়ে বলে—বিয়ে করব না আমি।

—তা কখনও হয়?—তালুকদার হাসেন একটু—আমি মরে গেলে তখন দেখবে কে তোকে? বিয়ে তোকে করতেই হবে।

বেগম আর কথা বলে না। চলে যায়।

বিকেলে ভদ্রলোক দু'জন স্টেশন থেকে আসছিলেন। একজন রোগা। আর একজন দোহারা, কাঁচাপাকা গোঁপ। গল্প করতে করতে আসছিলেন দু'জন।

বেগমদের বাড়ীর পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

ওদের বাড়ীর পেছনটা একটু জঙ্গলের মত। গাছপালায় ভর্তি। গোটা কয়েকটা পেয়ারা গাছ, কুল গাছও আছে। বেগম দুপুরের পরে এই বাগানটাতে থাকে অনেক সময়। কুল বা পেয়ারা নিদেন কয়েকটা কামরাঙা না খেলে ওর ভালই লাগে না।

বেগম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেয়ারা খাচ্ছিল।

ভদ্রলোক দু'জন আসতেই বেগম ডাকে—এই! শুনুন।

ভদ্রলোক দু'জন একটু দাঁড়ায়।

রোগাটি এগিয়ে আসে—এইটেই কি তালুকদার মশায়ের হ'ল গিয়ে—

বেগম চোখে বিদ্যুত হেনে বলে—কেন এসেছেন?

কাঁচাপাকা এগিয়ে আসে—তালুকদার মশায়ের বাড়ী কোথায় বলতে পার?

—এইটে। কেন বলুন ত'?

—একটি মেয়েকে দেখতে এসেছি।

বেগম ভ্রূ-দুটো কুঁচকে পেয়ারাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল—আমি সেই মেয়ে। কি দেখবেন বলুন?

—এঁ্যা!—রোগাটি একটু পিছিয়ে গেল।

কাঁচাপাকা একটু অমায়িক হেসে বললে—মা লক্ষ্মী নিজেই যখন দেখা দিয়েছ···

বেগম আর একটা পেয়ারা গায়ের জোরে ছুঁড়ে দিয়ে বলে—মা লক্ষ্মী-টক্ষি ওসব এখানে চলবে না। ভাল চাও ত' এখান থেকেই বিদেয় হও। নইলে ওই আধলা ইট মেরে ··

—এ্যাইরে।—রোগাটি বেশ খানিকটা পিছিয়ে যায়।

কাঁচাপাকা একটু দাঁড়ায়। বেগমের আগুনের মত রূপ আর চোখের ঝিলিকের দিকে তাকিয়ে বলে—সে কি কথা? আমরা এখুনি চলে যাচ্ছি। আবার আধ্‌লা ইট-টিট্ কেন? আমরা আর কি দোষ করেচি বল মা···আমরা হ'ল গিয়ে···আচ্ছা চলি।

রোগাটি বেশ খানিকটা তফাতে ছিল।

কাঁচাপাকা গিয়ে মিশল তার সঙ্গে। তারপর দু'জন হাঁটতে সুরু করল। হাঁটা নয়ত' প্রায় দৌড়োন।

বেগম আর একটা পেয়ারা তাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হাসতে লাগল।

তালুকদার সন্ধ্যে অব্দি অপেক্ষা করে আছেন। একবার ভেতর বাড়ী আসছেন, একবার বারবাড়ী যাচ্ছেন। বেগম একা ঘরে বসে বসে অনর্গল হাসছে।

এর দিন চারেক পর তালুকদার একখানা চিঠি পেলেন পাত্র-পক্ষের কাছ থেকে।

"মান্যবরেষু", তারপর সবিশেষ নিবেদন করেছে, "আপনার কন্যাকে অশেষ ধন্যবাদ যে আমরা প্রাণ লইয়া সেদিন ফিরিতে পারিয়াছি। আপনার কন্যা সাক্ষাৎ চামুণ্ডারূপিণী। তাহাকে আমাদের সষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাইবেন।" ইত্যাদি।

চিঠিখানা পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন তালুকদার। বেগমকে ডাকলেন। একটাও কথা না বলে চিঠিখানা হাতে দিলেন।

বেগম ভেতরে এসে চিঠিখানা পড়ল। তারপর ছিঁড়ে ফেলে দিল উনুনের ভেতর। লোকদুটোর মাথা ফাটিয়ে দিলেই বোধহয় সেদিন ভাল হ'ত। একটু আফশোষ হ'ল বেগমের।

এরপর দিন কয়েক আর বাবার ধার দিয়েও যায়নি বেগম।

জান্তব শক্তি মানুষের ভেতরে আছে ঠিকই, সেইটেকেই জীবনের একমাত্র সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন তালুকদার। আজীবন শুধু এই শক্তি সবেগে সজেদে চালনা করলেন। তালুকদার ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সংসারের আরও একটা দিক যে আছে, সেটা দেখতেই পেলেন না।

কি করেই বা দেখবেন? দম্ভের দিনগুলোয় মানুষের দৃষ্টিতে একটা ঘোর অন্ধকার থাকে। সেটা ভেদ করতে যে আলোর প্রয়োজন। সে আলোর সন্ধান পান নি কোন কালে।

তালুকদারের জীবন এই ভাবেই কেটেছে।

বেগমের ভেতরে এই শক্তির উৎস দেখে তিনি উৎসাহিত হয়েছেন।

ভেবেছেন সংসারে এইটেই নিতান্ত প্রয়োজন। সংসারটা শুধু মাত্র ভোগের জায়গা। সমর্থ দেহ আর সবল মন নিয়ে শুধু ভোগ করে যাও। প্রতিবন্ধক যা কিছু নির্মমভাবে সরিয়ে দাও।

পাপ করতেই বা দ্বিধা কি?

পাপ পুণ্য ত' মানুষের ভুয়ো বানান কথা।

কিন্তু আজ বিয়ের ব্যাপারে সেই বেগমের কাছ থেকে কয়েকটা ঘা খেয়েই হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন তালুকদার।

তারপর আজ একটা কথাই মনে হ'ল যে বেগম সংসারের কতকগুলো অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা বোধহয় পায় নি। এ জন্যে বেগমের কোন দোষ নেই। দোষ সম্পূর্ণ তাঁরই।

মনের সুক্ষ্মবোধ আর প্রশান্ত জ্ঞান তালুকদারের কাছে আজ একেবারে অজ্ঞাত। তাই হয়ত ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কিসের অভাব। কিসের অভাবে বেগম পুরোপুরি মানুষ হ'ল না। মেয়েমানুষ হ'ল না।

বিয়ে ওকে করতেই হবে। স্থির প্রতিজ্ঞা করলেন তালুকদার।

শাসন করা যাবে না বেগমকে। অনেক দেরী হয়ে গেছে। শাসনের দিন পেরিয়েও গেছে। ছেলেছুটোকে আর এভাবে চলতে দেওয়া যাবে না।

একটা কথা তালুকদারের মাথায় এলো যে, কিছু পড়াশুনো করা বোধহয় মানুষের দরকার। খোকন যেভাবে দিন দিন ছুর্দমনীয় হয়ে উঠছে, তাতে ওর পড়ার একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতেই হবে।

মনু পড়াশুনোয় ভাল, একটু দেখলে শুনলে হয়ত আরও ভাল হতে পারে। একটা মাষ্টার রাখা দরকার ওদের জন্যে। খুব ভাল একটি লোক রাখতে হবে, যার কাছ থেকে ঠিক ভাবে শিক্ষা পাবে ওরা।

খোঁজ করতে করতে পাওয়া গেল একটি ছেলে। বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। নম্র, বিনয়ী, চোখ তুলে কথা পর্যন্ত বলতে চায়না।

নাম, সদানন্দ রায়।

ক্রোশ আষ্টেক দূরে একটি গাঁয়ে থাকে। ঘরে মা আছেন। পিসিমা আছেন। ছোট একটি ভাই আছে। সামান্য জমিজমায় কোনমতে চলে। অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

পড়াশুনো করে। অসীম আগ্রহ পড়াশুনোয়। কিন্তু বরাতের দোষেই বোধহয় ছুবার ম্যাট্রিক ফেল করেছে। প্রস্তুত হচ্ছে তৃতীয় বারের জন্যে।

মাসিক দশটাকা সদানন্দর কাছে কম নয়। তাছাড়া খাওয়া থাকা, ছুটি ছেলেকে দেখাশুনো করতে হবে। তা মন্দ কি! সদানন্দ খুবই রাজী।

—আর একটি অভ্যেস আছে আমার। অতি বিনীতভাবে হেসে বলে সদানন্দ।

ওর ঠাণ্ডা স্বভাবটি দেখে তালুকদার খুসী হয়েছেন।

—কি বলো?

—সকালে আধপো'টাক ছোলা লাগে আমার। তা···দেড়-ছটাকেও চলবে।

—ছোলা ভিজিয়ে খাও বুঝি?

—আঁজ্ঞে হ্যাঁ। এক্‌সাইজ করি কিনা।

ওর পেশীবহুল কালো পাথরের মত শরীরটার দিকে তাকান তালুকদার।

—বেশত' ক্ষেতের ছোলা ত' ঘরেই থাকে।

তবে আর কি? সদানন্দ খুব খুসী।

—ছ্যাখ, এই ছোটছেলেটা আমার বড় রুগ্ন।

সদানন্দ তাকায়।

—ওকে যদি একটু বোঠ্‌কি-টোঠ্‌কি করাও, তবে ভাল হয়।

—নিশ্চয়ই করাব।

—বেশ তাহলে ওই কথাই রইল, ওই দক্ষিণের ঘরটায় তুমি থাকবে।

—যে আঁজ্ঞে।

—তাহলে তুমি কবে আসছ?

—কালই।

প্রণাম ক'রে সদানন্দ চলে যায়।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ একটা গোলাপফুল আঁকা টিনের স্যুটকেস আর সতরঞ্চি মোড়া ছোট একটা বিছানার পুঁটলি নিয়ে সদানন্দ হাজির। দাওয়ায় স্যুটকেস আর বিছানাটা রেখে ঘামে ভেজা লংক্লথের জামাটা আস্তে আস্তে খোলে পাছে ছিঁড়ে যায়। দাওয়ার ওপর বসে পড়ে খালি গায়ে।

শরীরটি ওর সত্যি দেখবার মত।

এতখানি চওড়া বুক, কোমরটি সরু। পেশীগুলো উঁচু হয়ে আছে হাতে পায়ে। দেহ আন্দাজে বরং মুখখানা একটু ছোট।

খোকন ভাত খাচ্ছিল। খেতে খেতে রান্নাঘর থেকে টেরিয়ে তাকায়।

মনু বলে—দাদা। মাষ্টার মশাই!

খোকন আর একবার ভাল করে দেখে বলে—কি চেহারা রে! খবরদার ওর হাতে যেন বেত না পড়ে। বেত জোগাড় করে আনলেই চুরি করে ফেলে দিতে হবে।

মনু আস্তে আস্তে বলে—বেত কেন? ওর শুধু হাতের একটা চড় খেলে···

বেগমও ভাত খাচ্ছিল। সকালের খাওয়া। আবার দুপুরে খাবে।

—কেরে মনু?—এতক্ষণে খেয়াল করে বেগম।

—আমাদের মাষ্টার মশাই।

উঁকি মেরে একটু দেখে বেগম।

দেখেই হাসতে থাকে।

—কি হ'লরে?

বেগম হাসি চেপে বলে—যেন একেবারে বুনো মোষ।

মনু বলে—দিদি কি যে যা তা বলে! মাষ্টার মশাই শুনতে পেলে ··

—আমার কি করবে শুনি? বেশী কিছু করে ত'···

নাকের পাতাদুটো ফুলে ওঠে বেগমের।

বলে—দুর্গাপূজোর মোষ না কিনে এবার ওকেই বলি দিয়ে দেব।

খোকন খুব হেসে ওঠে—কি যে বলে দিদি?

ওদের হাসির সঙ্গে সদানন্দ এধারে তাকায়।

বেগমের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নেয়। অমন রূপসী যৌবনবতী মেয়ের দিকে বেশীক্ষণ তাকাতে নেই। সদানন্দ উলটো দিকে চোখ ফেরায়।

খাওয়া সেরে খোকন সদানন্দর কাছে আসে। সঙ্গে মনু।

—মাষ্টার মশাই ভাত খাবেন না ?

সদানন্দর পাথরকালো মুখখানা উদ্ভাসিত হয়, সাদা ধবধবে দাঁত বার করে বলে- খাব। আগে ঘরের তালাটা খুলে দিতে বলো।

খোকন দৌড়ে গিয়ে বাবার কাছ থেকে চাবি নিয়ে আসে। নিজের হাতে তালা খুলে দেয়।

সদানন্দ গোলাপফুল মার্কা সুটকেস আর বিছানাটা নিয়ে ঘরে ঢোকে।

ছোট্ট ঘরখানি, বেশ খোলামেলা।

একখানি ছোট চৌকিও পাতা রয়েছে।

চৌকির ওপর বিছানা খুলে গামছা বার করে সদানন্দ। সুটকেসটা পাশে রাখে। গামছাটা কাঁধে নিয়ে বলে—হাত পা ধোবার জায়গা আছে ? পুকুরটা কোন দিকে ?

—পুকুর কেন, বাড়ীতেই জল আছে।

চাকরকে দিয়ে একবালতী জল তুলিয়ে দেয় ইঁদারার ধারে।

সদানন্দ গামছাটা নিয়ে ইঁদারার ধারে যায়। বেশ ভাল করে হাত মুখ ধোয়। বার বার কুলকুচো করে। বার বার হাত পা ধোয়। নাকে জল টানে। নাকটা ঝাড়ে।

খিলখিল একটা সুমধুর হাসির আওয়াজ শুনে তাকায় সদানন্দ। চোখে পড়ে সেই রূপসী ভরা-যৌবন নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখে হাসছে। অপরূপ সুন্দরী, চোখটা যেন ঝলসে গেল।

যুবতীর দিকে তাকাতে নেই।

মুহূর্তে একেবারে উলটো দিকে ঘুরে যায় সদানন্দ। বেগমের দিকে পিছন ফিরে গামছাটা কাচতে থাকে। বেশ পরিষ্কার করে ঘসে ঘসে কাচে। সব কাজই সদানন্দ বেশ পরিষ্কার নিখুঁত করে করতে ভালবাসে। এই ওর স্বভাব। মন্দ মানুষ বলে, বাতিক।

সদানন্দ কারো কথা শোনে না। হাত পা ছবারের জায়গায় পাঁচ-বার ধুলে বেশী পরিষ্কার হয়। গামছা পাঁচবারের জায়গায় সাতবার ধুলে ময়লা কাটে। এটা ত' অস্বীকার করার উপায় নেই। যারা বলে বাতিক, তারা আসলে আলসে।

হাত পা ধুয়ে ওই দিকে পিছন ফিরে সদানন্দ ঘরে ঢুকে যায়।

বেগম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল ওর নাকঝাড়া দেখে।

ওর দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে সদানন্দকে বোঁ করে পেছন ফিরতে দেখে বেগম একটু অবাক হয়। তবু দাঁড়িয়ে থাকে।

আর একবারও তার দিকে ফিরে না তাকিয়ে সদানন্দ যখন ঘরে ঢুকে যায়, দেখে বেগম রীতিমত অবাক হয়।

এও কি সম্ভব!

বেগমকে একবার দেখে আর একবার দেখবে না, এ ত' প্রায় অসম্ভব কাণ্ড।

আজ পর্যন্ত বেগম কোন পুরুষকে এমন করে পেছন ফিরে চলে যেতে দেখেনি। ও শুধু অবাকই হয় না। মুখটা ওর কালো হয়ে ওঠে।

এটা শুধু বিস্ময়ের ব্যাপার নয় অপমানেরও ব্যাপার।

বেগমের নিখুঁত যৌবনকে অস্বীকার করবার সাহস যে কোন ছেলের থাকতে পারে, এ ওর স্বপ্নের বাইরে ছিল। ছেলেটা বোধহয় খুব দাম্ভিক। নয়ত' মাথার দোষ আছে।

বেগম চুপ করে সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায়।

খোকন আর মনু মাষ্টার মশায়ের খাবারের জোগাড় করতে ব্যস্ত। এ ব্যস্ততার পেছনে একটু যেন তোষামোদের ভাব আছে।

সদানন্দ খাওয়া দাওয়া সেরে বই নিয়ে পড়তে বসে।

খোকনকে আর মন্নুকে বলে দেয়, ঠিক সন্ধ্যের আগে তার কাছে আসতে।

বেগমের বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে তালুকদার। দিনকতক পরে জানায় কোঁদপুর থেকে তিনটি লোক তাকে দেখতে আসবে।

কোঁদপুরের নাম শুনে বেগমের খুতুর কথা মনে পড়ে হাসি পায়। পরে ও শুনতে পায় খুতুর বাপ কাকারাই দেখতে আসবে। খুতুর সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। নন্তুদের খুদ্দা।

এ সব ওই মোট্‌কার চালাকি!

এমনি ত' জব্দ হয়েছে এখন বিয়ে করে জব্দ করবার মতলব!

আচ্ছা সেও দেখে নেবে।

তালুকদার বেগমকে ডেকে বলে—খুব বড়ঘরের মানুষ ওঁরা। লক্ষ টাকার কাঠের কারবার। একটু ভাল ভাবে কথাবার্তা বলবে। তোমার মা ত' নেই তাই আমাকেই বলতে হচ্ছে। এখানে বিয়ে হলে তুমি সুখী হবে।

বেগম চুপ করে শোনে।

সুখ না ছাই! ওই মোট্‌কাকে নিয়ে ঘর করা। ওই গরুটার সঙ্গে বিয়ে!

বাবার মুখের ওপর আর কিছু বলে না।

যথাসময়ে ভদ্রলোক তিনজন আসেন তাদের বাড়ী। বাইরের ঘরে বসান হয়। আপ্যায়নের ত্রুটি করেন না তালুকদার।

মেয়ে বিয়ে দিতে হলে অতি অমায়িক হতে হয়। অতি অমায়িক হওয়া তালুকদারের পক্ষে সম্ভব নয়। উনি কিছুটা অমায়িক হবার চেষ্টা করেন।

বেশ মোটা-সোটা ফরসা তিনজন ভদ্রলোক।

দেখলে মোটকা খুতুর বাপ কাকা বলেই মনে হয়।

বেগমকে সাজাতে আসে মঙ্গলার মা। মনোরমার দিদি।

চোখে কাজল দিয়ে, ঠোঁটে আলতা দিয়ে চুল বেঁধে সাজায়।

পাতলা সিল্কের সাড়ীটা পরিয়ে ওর মুখখানি তুলে ধরে মঙ্গলার মা।

—দুগ্‌গাপিতীমের মত দেখতে হয়েছে। এ মেয়ে কি পছন্দ না হয়ে পারে ?

—সত্যি রূপ যেন ফেটে পড়ছে ওর।

হাসে মনোরমার দিদি।

বেগমকে হাত ধরে নিয়ে যেতে চায়।

বেগম হাত ছাড়িয়ে নেয়। ও একাই যেতে পারবে। ভারি ত' তিনটে বুড়ো এসেছে। তার আবার ভয় ভাবনা। ওসব ন্যাকামি নেই বেগমের।

—প্রণাম করো। বলেন তালুকদার।

—থাক, থাক।—বলে ওঠেন তিন বুড়ো।

—বেশ! বাঃ! সুন্দর মেয়েটি।

ওর রূপে সবাই উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠেন।

বেগম চোখ তুলে বেশ বড় বড় করে তাকায় সবচেয়ে মোটা বুড়োটার দিকে। এইটেই বোধহয় খুতুর বাবা।

বুড়ো ওর তাকানিতে একটু ভড়কে যায়।

মেয়ে দেখতে গিয়ে মেয়ের এমন তাকানি জীবনে দেখেনি বুড়ো।

তবু বলেন—বেশ। তা বেশ। তোমার নাম কি মা ?

—বেগম।—পট্ করে জবাব দেয় বেগম।

—না, না, পুরো নাম। ভাল নাম কি ?

—থাক। থাক।—আরেক বুড়ো বলে—আচ্ছা তুমি রান্না জান ?

—না। বেগম বড় বড় চোখ করে তাকায়।

—সেলাই জান ?

—না।

—গান জান ?

—না।

—পড়তে জান ?

—না।

—লিখতে জান ?

—না।

তালুকদারের মুখটা ক্রমশঃ কালো হয়ে ওঠে। বেগম যত 'না' বলছে, তালুকদারের মুখ ততই শুকোচ্ছে। বেগমকেও দোষ দেওয়া যায় না। ও ত' সত্যিই কিছু জানে না।

বেগম উঠে চলে যায়।

বুড়ো তিনজন ওঠেন। তালুকদারও ওঠেন। উঠে কোন লাভ নেই। তবু ওঠেন।

তৃতীয় বুড়োটি একটু রসিক।

বলেন—আপনার মেয়ে দেখলুম।

তালুকদার হাসেন, জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। তবু জিজ্ঞেস করেন—কেমন দেখলেন ?

—আপনার বেগমের জন্যে বাদশার খোঁজ করুন। আমাদের গরীবের ঘরে ওকে মানাবে না।

বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে হন হন করে চলে যায়।

তালুকদার মুখটা কালো করে ঘরে এসে চুপ করে বসে থাকে।

মাস ছয়েক কেটে গেছে। তালুকদার চেষ্টা ছাড়েননি। আরও বেশী করে চেষ্টা করছেন বেগমের বিয়ের জন্যে। ঠিকমত পাত্রের সন্ধান মিলছে না।

বেগমের ভাব-ভাবনা কিছু নেই। আগের মতই কাটছে ওর। শুধু মাঝে মাঝে একটু ধোঁকা লাগছে ওর সদানন্দের ব্যবহারে। বয়েসে ত' বেগমের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোটই হবে। অথচ ছেলেটা ওর দিকে তাকাতে পর্যন্ত চায় না।

হয়ত বেগম পুকুর থেকে আসছে স্নান করে। ভিজে সাড়ীটা পরনে।

সদানন্দ স্নান করতে যাচ্ছে।

ভিজে সাড়ী পরা বেগমকে দূর থেকে দেখেই দশ হাত তফাতে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকে। ভিজে সাড়ী পরে থাকলে বেগমের দিকে তাকাবে না, এত প্রায় অভাবণীয় ব্যাপার। বেগম অবাক হয়। রাগও যে না হয় তা নয়।

শরীরটা জ্বলে ওঠে ছেলেটার অদ্ভুত চালচলনে।

ইচ্ছে হয় গিয়ে ঘাড়টা ধরে ওর দিকে ঘুরিয়ে দেয়। রেগে ফুলতে ফুলতে চলে যায় বেগম।

সদানন্দ কিছুক্ষণ পরে চোখ ফেরায়।

দেখে বেগম চলে গেছে। মেটে পথে ভিজে পায়ের দাগ। পায়ের দাগের দিকে একটু সময় তাকিয়ে থেকে সদানন্দ দাঁতন করতে করতে পুকুরের দিকে এগোয়।

স্নান সেরে এসে সদানন্দ রান্নাঘরের দাওয়ায় খেতে বসে। রাঁধুনীর বদলে বেগম ভাতের থালা নিয়ে আসে ওর সামনে। সদানন্দ একবার দেখেই ঘাড় নীচু করে।

বেগম ইচ্ছে করেই আজ ভাত দিতে এসেছে।

রাঁধুনীকে বলেছে—তুই সর! মাষ্টারের ভাত আমি দেব।

রাঁধুনী একটি কথাও না বলে সরে দাঁড়িয়েছে।

বেগমকে কেউ ঘাঁটায় না। ওর মুখের ওপর একটা কথাও বলে না। কিসের থেকে কি হবে। পান থেকে চূণ খসলে অনর্থ বাধিয়ে দেবে বেগম। হয়ত এঁটো হাতে একটা চড়ই মেরে বসবে।

রাঁধুনী পারতপক্ষে ওর সঙ্গে কথাই বলে না। ও যেমন চায় তেমনি করে।

ভাতের থালা নিয়ে এসে বেগম মাষ্টারের সামনে রাখল।

দেখল সদানন্দ ঘাড় নীচু করে রয়েছে।

সন্তস্নান করে বেগমের সুগৌর মুখখানি মসৃণ ভিজে ভিজে। চোখের বাদামি মণি দুটো কৌতূহলে নেচে উঠল।

ডাল আর ভাজা দিয়ে সামনে বসে পড়ল বেগম।

সদানন্দ বেগমের ধবধবে নিটোল হাতদুখানির দিকে তাকিয়েই আবার মাথা নীচু করল। ফরসা ফুলো-ফুলো পায়ের পাতা দুটিতে চোখ পড়ল।

এবারে ভাতের দিকে নজর দিল সদানন্দ।

বেগম ওকে কথা বলাবেই।

ডালের বড় বাটিটা থেকে ওর পাতে ডাল ঢালতে সুরু করল। ঢালচে ত' ঢালচেই।

সদানন্দর মুখখানা বেগুণী হয়ে গেল। এত ডাল! ওরে বাবা! এ যে আরও ঢেলেই চলেছে!

—উঁহুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ! মুখ দিয়ে ঠিক নয়, নাক দিয়ে শব্দটা বেরুল সদানন্দর।

বেগম ডাল ঢালা থামিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল।

তবু ভাল করে কথা বলল না লোকটা। ভাল করে তাকাল না।

মাঝে মাঝেই সদানন্দর কথাটা বেগমের আপনা থেকেই মনে পড়ে। ছেলেটা বোধহয় একদম ভীতু। কিন্তু অমন ষণ্ডা চেহারা আর এত ভীতু!

এই বোধকরি প্রথম পুরুষ যার কথা দিনে দু'চারবার করে না ভেবে পারছে না বেগম। ঘুরে ঘুরেই মনে হয় ওর এত ভয়ের আর লজ্জার কারণটা কি?

অবহেলা নয়ত’? ভয় লজ্জা হলে তেমন গায়ে লাগে না।

কিন্তু অবহেলা? ভাবতেও পারেনা বেগম।

সেখানে ওর রূপের গর্বে ভরাযৌবনের দম্ভে ঘা পড়ে। এই জায়গাটাই ওর একমাত্র দুর্বলতা। ও ভাবে, এই একটি সম্পদ নিয়ে ও পৃথিবী জয় করতে পারে। নারীজন্মে অফুরন্ত যৌবন আর অসামান্য রূপ যে কত বড় শক্তি আর সম্পদ, তা ও প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারে। কিন্তু আচ্ছন্ন মনে এটা কখনও জানতে পারে না যে এইটেই ওর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। এইখানেই এ জীবনে ওকে বারবার পরাজয় স্বীকার করতে হতে পারে।

বেগম জানবে কি করে যে দম্ভ জিনিষটা দুর্বলতারই এক বিকৃত প্রকাশ? সত্যিকারের সবলতা যেখানে, সেখানে দম্ভ নেই। এ সহজ সত্যটা বোঝবার মত মনের অবস্থা বা বুদ্ধির বিচার ক্ষমতা বেগমের ছিল না।

সদানন্দ জেনে হোক, না জেনে হোক ওর এই দুর্বল জায়গাটাই আঘাত করল। এই প্রথম এক অন্য অনুভূতিতে একটু যেন মুষড়ে পড়ল বেগম। পরাজিত হতে ও শেখেনি। বিনয় কাকে বলে ও জানে না।

এই সামান্য একটা কালো মিশমিশে ছেলে তাকে এত অবহেলা করবে? অসহ্য! যতই ভাবতে লাগল, ততই রাগতে থাকে বেগম।

দু’চারটে দিনেই ওর মন প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মনে মনে কত প্রতিজ্ঞাই যে করল। একটা প্রতিজ্ঞা ও বেশ জোর করেই করল, সদানন্দকে দিয়ে ও নিজের পা টেপাবে, তবে ছাড়বে।

পরমুহূর্তেই মনে মনে ভয় পেল তা কি সম্ভব হবে?

যে তার দিকে আজ দু’মাস ধরে ভাল করে তাকালনা, তাকে দিয়ে পা টেপান! এ কেমন করে সম্ভব হবে। সম্ভব অসম্ভব

ভাববার মত অবস্থা তখন ওর নয়। ওর অন্ধ মন তখন চোখ বুঁজে হাত পা ছুঁড়ে চলেছে।

অবহেলা তার পক্ষে অসহ্য!

আজই বেগম যাবে। আজই দুপুরে ওর ঘরে যাবে।

কখনও কোন পুরুষের কাছে সেধে ও যায়নি।

নিজে থেকে যেতে হয়নি কারো কাছে। এর কাছে যেতে হবে। যাবে বেগম। ও ভাল করে দেখে নিতে চায়, ওকে অবহেলা করবার সাহস ছেলেটা কোত্থেকে পেল।

এই দিনকয়েকে বেগম একটু গম্ভীরও হয়ে গেছে। এই প্রথম বোধহয় জীবনে ও গম্ভীর হ'ল। ভাবনা কাকে বলে এতদিন জানত না বেগম। এই বোধকরি প্রথম ওকে অনেক সময় একটা পুরুষের কথা ভাবতে হ'ল।

যেতেও হ'ল ওকে সদানন্দর ঘরে নিজে থেকে। নিজেকে একটুখানি নীচু করতে গিয়ে এমন আঘাত পেল যে বার বার নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, ওকে দিয়ে পা টেপাবেই। এই ওর প্রতিজ্ঞা।

দুপুরে একটু মেঝেতে গড়িয়ে নিয়ে ঘুম-ঘুম মুখে ও সদানন্দর ঘরের দিকে এগোয়। ঘরের দোরটা ভেজান ছিল। ঠেলতেই খুলে যায়।

সদানন্দ চৌকির ওপর শুয়ে পায়ের ওপর পা রেখে একখানি বই পড়ছিল। বোধহয় প্রবেশিকা পরীক্ষার কোন পড়া।

বেগম ঘরে ঢুকতেই ও চমকে তাকায়।

বেগম একটু হাসে।

সদানন্দ তড়াক করে উঠে পড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়।

বেগম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলে—দাঁড়াও।

—আঁজ্ঞে। সদানন্দর মুখ বেগুণী হয়ে গেছে।

—তুমি আমাকে দেখলে অমন পালিয়ে বেড়াও কেন বলত' ? আমি কি বাঘ না ভাল্লুক ?

সোজা প্রশ্ন করে বেগম। যা বলতে হবে, সেটা সোজা করে ও বলতে পারে চিরকাল।

সদানন্দ মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—তুমি ত' খোকন মনুর মাষ্টার। আমার চেয়ে বয়েসও বোধ-হয় ছোট। আমার বয়েস কত জান ?

সদানন্দ এতক্ষণে একটু তাকায় ওর দিকে। ভয়ে ভয়ে।

বেগমের সর্বশরীর যেন ওকে আকর্ষণ করছে। ক্রমেই একটু একটু করে এগোচ্ছে বেগম।

—তোমার বয়স কত ?

—আঠারো। ভয়ে ভয়ে বলে সদানন্দ।

—নাম কি ?

—সদানন্দ রায়।

—আমি অত বড় নাম ধরে ডাকব না। সদা বলে ডাকব।

—আমার নাম জান ?

—না।

—বেগম।—খিল খিল করে হেসে ওঠে বেগম—কেমন ভাল নাম নয় ?

সদানন্দ মুখ নীচু করে বসে থাকে।

—নামটা বেশ পছন্দ হয় না ?

সদানন্দর মুখ শুকিয়ে যায়। উঠে পড়ে তক্ষুণি।

বলে—আমি যাই।

বেগম ওর একখানা হাত ধরে ফেলে খপ করে—বোস। কোথায় যাবে ?

সদানন্দর শরীরটা কেঁপে ওঠে। কালো শরীর ওর ঘামে ভিজে ওঠে।

হাত ছেড়ে দেয় বেগম।

—ভয় নেই, একটু গল্প করে চলে যাব। বোস।

সদানন্দ বসে পড়ে। ওর এত ভয় করছে! ও কখনও কোনও মেয়ের সঙ্গে এরকম একা একা বসে গল্প করেনি। ছোটবেলা থেকেই ও মেয়েদের একটু এড়িয়ে চলে। এটা ওর স্বভাব। তাছাড়া ওর ব্যায়ামের গুরু ওকে বলে দিয়েছে, যুবতীর দিকে তাকাবে না।

কথাটা ও জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু একি মেয়ে রে বাপ!

এমন সুন্দরীও জীবনে দেখেনি আর এমন মেয়েও জীবনে দেখেনি। প্রথমদিন হাসিটা শুনেই ওর একটু কেমন-কেমন লেগেছিল। তারপর দু একদিন চোখের পলকে দেখে ও মাঝে মাঝে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভেবে ফেলত বেগমের আশ্চর্য রূপের কথা। সুগৌর সুস্পুষ্ট দেহের কথা।

পরমুহূর্তেই ওই একটি মাত্র কথা ওকে এ চিন্তা থেকে বাঁচাত। যুবতীর কথা ভাবতে নেই। যুবতীর দিকে তাকাতে নেই।

কিন্তু গুরুর আদেশ যে ভেসে গেল দেখতে পাচ্ছে। সামনে এসে হাজির হয়েছে, না তাকিয়ে উপায় কি? বুক কাঁপতে সুরু করেছে সদানন্দর।

বেগম ঘরোয়া কথা পাড়ে—তোমার খাওয়া দাওয়ার কোন কষ্ট হচ্ছে নাতো?

এবার সদানন্দ তাকায়—না।

—কোন অসুবিধে হলে আমায় বলো। কেমন?

—আঁজ্ঞে।

হঠাৎ বিছানার চাদরটা তুলে বেগম বলে—ওমা, তোমার বিছানার চাদরটা এত ময়লা, চাকরকে কাচতে দাওনি কেন?

—আমি নিজেই কেচে নেব।

—তুমি নিজে কাচবে কেন শুনি? তুমি ত' এখন এ বাড়ীরই মানুষ। বাড়ীর সব কাজ ত চাকরের করবার কথা?

—আপনি মিছিমিছি ইয়ে করবেন না। ও আমি কেচে নেব! সদানন্দ ধবধবে সাদা দাঁত বার করে হাসে।

এতক্ষণে তাহলে হাসতে পেরেছে সদানন্দ! একটু যেন সহজ হয়ে উঠছে কথাবার্তায়।

—না, সে আমি শুনব না। চাদর এক্ষুনি চাকরকে দিয়ে দেব। আর ছ্যাখ…

—কি?

—আমার কিন্তু খুব রাগ। এ বাড়ীর সবাইকে জিজ্ঞাসা কর, শুনতে পাবে। আমায় কিন্তু রাগিও না। যা বলব তাই শুনবে।

টানাটানা চোখদুটো ঝিকঝিক করে ওঠে দুষ্টমী ভরা হাসিতে।

—শুনবে ত'? হেসে ওঠে বেগম। ওর হাসিটা বড় আকর্ষণ করছে সদানন্দকে। এমন সুন্দর হাসি। ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখা যায় পাতলা ঠোঁটের মধ্যে।

সদানন্দ তাকিয়ে থাকে।

কোন কথা বলতে পারে না। বলতে ইচ্ছেও হয় না। শুধু দেখতে চায়। এখন একটু সাহস করে ও বেগমের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারছে। দেখছে আর মুগ্ধ হচ্ছে। মুগ্ধ হচ্ছে আর অভিভূত হয়ে পড়ছে।

সাড়ীটা সাপটে কাঁধের ওপর ভাল করে তুলে বেগম বলে —যাই। বলেই একটু বেঁকিয়ে তাকায়ে হাসে।

সদানন্দ তাকিয়ে থাকে। মুখ আর নীচু হয় না।

এরপর থেকেই সদানন্দের ঘুমের ব্যাঘাত হতে সুরু হ'ল। তাতে যে ও এখন খুব অখুসী হচ্ছে তা নয়। বেশ ভালই লাগছে ভাবতে। ভাবনাটা হলোও বেশ জমাট।

বেগম হঠাৎ ওর কাছে কেন এলো? কেনই বা সেধে এত কথা

বলল ? অদ্ভুত মেয়েটি কিন্তু। কথাগুলো ভারি অদ্ভুত। ও হঠাৎ ওই কথাটা বলল কেন, বেগম নামটা তার পছন্দ হয় কিনা ? তার পছন্দ অপছন্দে কি আসে যায় ওর ?

আশ্চর্য ! এমন অবস্থাপন্ন, এমন অপরূপ সুন্দরী। তার মত একটা গরীব কালো ছেলের সঙ্গে এত কথা যে কেন বলল ভেবেই পেলনা সদানন্দ। আর ওর নরম হাতের স্পর্শের কথা ভাবলে এখনও সদানন্দর রোমাঞ্চ হয়। ভয় ভয় করে। ও ত' স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি এমন রূপসী মেয়ের স্পর্শ ! এত ভাগ্য ওর কি করে হতে পারে ! সংসারে এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি আছে ? সদানন্দর আঠারো বসন্তের মনে প্রথম এক আরামের অস্বস্তি জাগে। এ অস্বস্তি যে কি মধুর ! শুধু ভাবতে ভাল লাগে। আবার দেখতে ইচ্ছে হয়। কথা শুনতে ইচ্ছে হয়।

কয়েকদিন কেটে গেল। কই আর ত' আসছে না বেগম ? চাদরটা নিয়ে গেল সেটাও আর ফেরত দিচ্ছে না। কি হ'ল বেগমের ? মনুকে একবার জিজ্ঞেস করবে কি ? না, থাক ! কেমন বাধো বাধো লাগে। তবু ও পড়াতে গিয়ে মনুকে বলে—তোমার দিদি কোথায় ?

—কি জানি ? ডাকব ?

—না ডাকতে হবে না।

—কিছু বলব ?

—থাক বলতে হবে না।

আবার কিছুক্ষণ পরে বলে—তোমার দিদি দুপুরে কি করে ?

—একটু ঘুমোয়। তারপর বাগানে যায়।

—বাগানে কি করে ?

—কামরাঙা, পেয়ারা এইসব খায়, তারপর বেড়াতে যায়।

—কোথায় ?

—মঙ্গলাদির বাড়ী। সেখান থেকে আরও কোথায় কোথায় সব ঘুরে বেড়ায়।

সদানন্দ চুপ করে শোনে।

তারপর একবার বলে—তোমার দিদিকে লুকিয়ে একটা কথা বলতে পারবে ?

—কি ?

— বলবে, চাদরটা না হ'লে আমার অসুবিধে হচ্ছে।

—বলব। ঠিক বলব।

বলে মনু চলে যায়।

সেইদিনই বেগম আসবে ভেবেছিল সদানন্দ। ও দুপুরে চৌকির ওপর শুয়ে বই খুলে পড়বার চেষ্টা করল। একটুও পড়তে পারল না। শুয়ে শুয়ে কেবলই ভাবতে লাগল এই বুঝি এলো !

দরজায় একটু শব্দ শুনে চমকে তাকাল। না। বেগম এলো না। সদানন্দ যেন অস্থির হয়ে উঠল। সন্ধ্যায় মনুকে আর জিজ্ঞেস করে না সদানন্দ। জিজ্ঞেস করতে ভয় করে। তার বোধ-হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। একটু অন্যায় হচ্ছে।

মনু আর খোকন চলে যায়।

সদানন্দ বাগানের দিকের জানালাটা খুলে দিয়ে নিজের পড়ার বই খুলে বসে। বইটা খুলে বাগানের দিকেই তাকিয়ে ছিল সদানন্দ। একটু গরম লাগছিল, গুমট গরম। আকাশে মেঘ করেছে। বাগানটা অন্ধকার। জোনাকীর আলো দেখা যাচ্ছে এধারে ওধারে ঝোঁপেঝাড়ে। দূরে মাঠের ওপারে গাছগাছালির কালো ছায়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আকাশের নীচে।

—এই ওঠো।

একটা ঠেলা খেয়ে চমকে ওঠে সদানন্দ।

—আপনি !

বেগম চাদর হাতে দাঁড়িয়ে হাসছে। সেই মারাত্মক হাসি।

—ওঠো। চাদরটা পেতে দিই।

সদানন্দ মুখটা আপনা আপনি খুসীতে ভরে উঠে।

হঠাৎ বলে ফেলে—আপনি এতদিন এলেন না কেন?

আবার হাসি বেগমের—ইচ্ছে করেই আসিনি। তুমি খুব ভাববে আমার জন্যে, তাই। ভেবেছ কিনা বলো? সত্যি কথা বলো?

সদানন্দর কালো রঙের কানছুটো গরম হয়ে ওঠে।

ধরা পড়ে গেছে সদানন্দ।

বেগম হাসতে হাসতে ওর পাশে চৌকির ওপর বসে পড়ে।

গায়ে প্রায় গা লাগে আর কি?

সদানন্দ সরে বসতেও পারে না। ঘেঁষে বসতেও পারে না।

বেগমের গায়ের গরম হাওয়াটা ওর গায়ে অনুভব করে।

—সত্যি বলছি, সময় পাইনি। রাগ কোর না।

—কি যে বলেন! রাগের কি? মানে চাদরটা না হলে একটু ইয়ে হচ্ছিল কিনা!

—খুব ইয়ে হয়েছে, এখন ওঠো।

সদানন্দ উঠে চৌকি থেকে নামে। নামতে গিয়ে বেগমের গায়ে ধাক্কা লেগে যায়।

বেগম ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চাদরটা পাততে থাকে বিছানার ওপর। সদানন্দ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। কোন কথাই আর মনে আসছে না।

বিছানা পেতে বেগম বসে পড়ে আবার।

—বলো এবার ডেকেছিলে কেন?

বলে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় বেগম।

সদানন্দর কান ছুটো ঝাঁ ঝাঁ করে।

—বোস।

সদানন্দর না বসে আর উপায় নেই।

—তোমার বাড়ীতে মা আছেন ?

—হ্যাঁ।

—মাকে ছেড়ে এখানে থাক, মনটা খারাপ লাগে না ?

বুকের পেশী একটু ফুলে ওঠে সদানন্দর। বলে—না, তেমন আর কি ?

—মা খুব ভালবাসে ত' ?

—তা বাসে।

—আর কে ভালবাসে ?

—আর কেউ না।

—কি করে জানলে ?—একটু একটু হাসছে বেগম।

সদানন্দ কি বলবে ঠিক করে উঠতে পারে না। লিচুরশাঁসের মত জোলো চোখদুটো মেলে তাকায় বেগমের দিকে। চোখ এত নিরীহ শান্ত!

ওর নিস্তেজ ঠাণ্ডা চোখের দিকে তাকিয়ে বেগমের হাসি পায়। ঠিক উজ্‌বুকের মত চাউনি।

—কিছু বুঝতে পাচ্ছো না ?

সদানন্দ তাকায়।

—তুমি একটা আস্ত গবেট।

একটু একটু করে সদানন্দর যেটুকু ব্যক্তিত্ব ছিল, সেটুকু গ্রাস করে ফেলছে বেগম। বেগমের সুতীব্র ক্ষুধা বড় নির্মম। বাঘিনীর মত খেলিয়ে গ্রাস করে ফেলে।

—হ্যাঁ করে তাকিয়ে আছে গ্যাখ!

খিলখিল করে হাসে বেগম।

—না মানে—। সদানন্দ কি একটা বলতে চায়।

বেগম বলে—তোমায় কোন মেয়ে ভালবাসেনি ?

সদানন্দ এমন সটান প্রশ্নে ভয় পেয়ে যায়।

বলতে চায়—কই সেরকম ত'—মানে কিরকম ধারা—?

—আরে দুর !—বেগম হাসতে হাসতে চৌকিটার ওপর শুয়ে পড়ে—মেয়ে। মেয়ে বোঝ না? বউ। বউয়ের মত কেউ ভালবাসে ?

সদানন্দ চোখটা নীচু করে ফেলে।

ওর মাথাটায় সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। এমন সব ভীষণ ভীষণ কথা এমন মেয়ের মুখ থেকে শোনা ওর ভাবনার বাইরে।

সদানন্দ দাঁড়িয়ে থাকে।

—ইদিকে এসো।

সদানন্দ দাঁড়িয়েই থাকে।

ওর হাতটা ধরে বেগম চৌকির ওপর বসায়।

—শোন।

সদানন্দ কিছুতেই আর চোখ তুলতে পারে না।

—তবে চলে যাব আমি।

এবারে ভয়ে ভয়ে চোখ তোলে সদানন্দ।

—শোন। কাউকে বোল না যেন।

—কি ?

—আমি যদি তোমাকে খুব ভালবাসি, তোমার আপত্তি আছে ?

আপত্তি! সদানন্দর মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে। চৌকির ওপর দু'হাত রেখে টাল সামলায়।

—আমি ভালবাসব, গল্প করব, আসব, বসব। রাগ করবে না ?

রাগ। পাথরের মত ঠাণ্ডা গা গরম হয়ে উঠছে। রোদে পোড়া পাথরের মতই গরম হয়েছে।

আমাকে তোমার কেমন লাগে ?—বেগমের গলার স্বরে আন্তরিকতার অভাবটা একটু ভাল করে শুনলেই টের পাওয়া যেত।

ভাল করে শুনবে কে ? বেগমকে ওর কেমন লাগে একথা যে কানে শুনতে পেয়েছে কোনমতে এইটেই যথেষ্ট। ওর শরীরের ভেতরটা কেমন কেমন করে যেন!

বলিষ্ঠ শরীরটা দু'বার যেন কেঁপে ওঠে। কালো ঠোঁটদুটো শুকিয়ে আসছিল। একটু জল খেতে পেলে ভাল হ'ত।

বেগম কাত হয়ে শুয়ে মাথাটা হাতের ওপর রাখে। সবকিছু অধিকার করে বসেছে যেন এমনি মুখের ভাবখানা।

—শোন, রোজ আমি আসব। সন্ধ্যের পর।

—রোজ ?—এতক্ষণে কথা বলতে পারে সদানন্দ।

বেগম হাসে—বেশ রোজ না হয় মাঝে মাঝে।

সদানন্দ ভাবে একবার বলবে, রোজ এলেই বা ক্ষতি কি ? কিন্তু বলতে পারে না।

বেগম ওর কাঁধে হাত রেখে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পড়ে।

—আজকে যাই। এবারে বাবা খেতে আসবে। বাবার সঙ্গে আমাকে খেতে বসতে হয় রাত্তিরে। নইলে রেগে যান বাবা।

—আপনার বাবা ত' আপনাকে খুব ভালবাসে।—বলে এতক্ষণে সদানন্দ।

—তা বাসে। তার চেয়েও বেশী আমাকে যে ভালবাসবে তার অপেক্ষা করে আছি।

সদানন্দ ভাবে, বলবে নাকি কিছু উত্তরে ?

থাক। চুপ করেই থাকে সদানন্দ।

বেগম যাবার সময় ওর বিশাল পিঠটায় একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে চলে যায়। ঠিক যেন একটা কালো বাঘা কুকুরকে পোষ মানাচ্ছে ও।

দম্ভভরা চিন্তাগুলো যখন সফল হয়ে ওঠে, তখনই মানুষকে

সবচেয়ে বেশী নীচে নামায়। সে যে কতখানি নেমে যায় নিজে বুঝতে পারে না। বুঝতে পারবার মত অবস্থাও তার থাকে না।

বেগমের দম্ভে যে আঘাত পড়েছিল সেটা যে সম্পূর্ণ অহেতুক। এই কথাটা যখন ও বুঝতে পারল, তখন ওর বুদ্ধি এত বেশী আচ্ছন্ন হয়ে উঠল যে জীবনের ওই একমাত্র দম্ভই ওর সর্বস্ব হয়ে উঠল। ওকে যে কেউ অবহেলা করতে পারে, এটা সত্যি একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল। এই বিশ্বাস ওর প্রতিটি ভঙ্গীতে প্রকাশ পেতে লাগল।

সদানন্দকে ও এত বেশী আকর্ষণ করল যে সদানন্দর ও ছাড়া আর কোন অস্তিত্বই রইল না।

বোকা বলিষ্ঠ ছেলেটা দিনরাত্রি বেগমের চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে দিল একেবারে।

ওকে এমন ভাবে জয় করতে পারবে বেগম নিজেও বোধহয় আগে ভাবতে পারেনি।

আজকাল বেগম এসেই হয়ত সদানন্দর বিছানাটায় শুয়ে পড়ে।

ওর পুষ্ট দেহের প্রতিটি ভঙ্গীমা এত অপরূপ লাগে সদানন্দর যে ও মাঝে মাঝে শুধু তাকিয়েই থাকে। চাউনি কিন্তু লিচুর শাঁসের মত নিস্তেজ।

হেসে ওঠে বেগম—অমন হাঁ করে কি দেখছিস ?

সদানন্দকে আর 'তুমি' বলারও প্রয়োজন বোধ করে না বেগম। তাদের বাড়ী থাকে, খায়, মাইনে নেয়, বলতে গেলে চাকর। তার ওপর বয়েসেও সামান্য ছোট।

তার ওপর এখন ওকে তুই কেন তারচেয়েও বেশী কিছু বললেও আর সদানন্দর রাগ করবার পথ নেই। ওর একমাত্র পথ এখন বেগম যা বলে তাই করা।

—বোস্।

সদানন্দ পাশটাতে গা ঘেঁষে বসে।

—তুই কি গরমের ছুটিতে বাড়ী যাবি ?

সদানন্দর মুখটা শুকিয়ে যায়—যেতে ত' হবে।

—তা যাবি।

—আপনাকে ছেড়ে কি করে থাকব তাই ভাবছি।—ছ'চারটে কথা বলতে পারে সদানন্দ।

বেগম হাসতে হাসতে বিছানায় গড়ায়।

—মায়ের চেয়েও আমি বেশী ?

সদানন্দ ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

—বেশ তবে যাসনি।

—আপনার বাবা যদি কিছু মনে করেন ? আপনি বলুন না, আপনার বাবাকে, আমি থাকব।

—থাকবি আর জ্বালাবি।

—আমি জ্বালালুম কই ?

—জ্বালালুম কই ?—বেগম যেন বিরক্ত হয়—না। তোর ওসব ন্যাকামি ছাড়। বাড়ী যা ছুটিতে। এখন আর তোকে আমার ভাল লাগে না।

সদানন্দ চুপ করে থাকে। চোখছুটো চিকচিক করে।

—একটা আস্ত উজবুক তুই। একটু বুদ্ধি থাকলেও বাঁচতুম।

সদানন্দ চোখ জলে ভরে আসছে।

—এইরে। থাক বাপু। তোকে যেতে হবে না। বলব'খন বাবাকে।—হাসতে হাসতে পাশ ফিরে শোয় বেগম।

বাইরে বাতাসের বেগ একটু বাড়ছে মনে হয়। বৈশাখের ঝোড়ো বাতাস উঠেছে। জানালাটা বন্ধ করে দেয় সদানন্দ। দরজাটাও।

—সব বন্ধ করে দিলি ? কেউ যদি এসে পড়ে ?

—তবে খুলে দিই।

—থাক।

বেগম শুয়ে শুয়ে একটা অপূর্ব আরাম অনুভব করে।

—শোন সদা।

—কি ?

—আমাকে নিয়ে তুই কি করতে চাস ?

সদানন্দ নীরব।

—কি চাস ? আমার মন চাস, না আর কিছু ?

সদানন্দ কথা বলে না।

—কি চাস ?

আস্তে আস্তে বলে সদানন্দ--কি করে জানব। বুঝতে পারি না।

—তুই একটা বোকা।

সদানন্দ কথা বলতে পারে না।

—আমি ত' তোকে কিছুই দিইনি। তবু কেন যে তুই এমন করিস ?

—আমি ত' কিছুই চাই না।

সদানন্দর গলাটা একটু গম্ভীর শোনায়।

—বলিস কিরে ?—বেগম হাসতে থাকে—কিছু না।

সদানন্দ খুব আস্তে বলে—শুধু দেখতে ইচ্ছে হয়।

—তোর চোখদুটো ত' রুইমাছের মত, ও চোখে কি দেখবি শুনি ?

সদানন্দ নীরব।

বেগম এপাশ ওপাশ করে বলে--আজ আবার পা টা চিবোচ্ছেরে ?

বলে একবার ফিক করে হাসে সদানন্দর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

সদানন্দ নীরবে গিয়ে বেগমের পা দুটো ওর বলিষ্ঠ হাতে ধরে টিপতে থাকে।

—আস্তে। লাগে।

আস্তে আস্তে টিপে দেয় সদানন্দ।

ওরকম ধবধবে পরিষ্কার পা দুখানির দিকে তাকিয়ে সদানন্দ যেন তন্ময় হয়ে যায়।

খুব সন্তর্পণে খুব যত্ন করে টিপে দিতে থাকে।

বাইরে বাতাসের বেগ বেড়েছে। গাছপালার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বৃষ্টিও বোধহয় সুরু হ'ল।

বেগমের চোখ দুটো বুঁজে আসে আরামে।

—সদা।

—কি ?

—ঝড় উঠল বোধহয় ?

হ্যাঁ।

—তোকে সত্যি মাঝে মাঝে আমার ভাল লাগে সদা।

সদানন্দর গলা শোনা যায় না।

—তোকে আমি জীবনেও ছাড়ব না। আমি জানি—।

—কি ?

—আমি জানি। তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না। বিয়ে হয়ত অন্য কোথাও হবে। কিন্তু তুই বিয়ে করিস নি যেন। বিয়ের পর আমার কাছে দেখা করতে যাবি। মাঝে মাঝে। তুই আমার হয়ে থাকবি চিরকাল। পারবি থাকতে ?

—তাই থাকব।

—পা ছুঁয়ে দিব্যি কচ্ছিস ত' ?

—হ্যাঁ।

—যদি তোর মা বিয়ে দিতে চায় ?

—করব না বিয়ে।

—যদি অন্যকোন মেয়েকে তোর ভাল লাগে ?

—লাগবে না।

—কেন ?

—আপনার মত মেয়ে পৃথিবীতে আর বোধহয় নেই।

বেগম হেসে ওঠে—মাঝে মাঝে তুই কিন্তু বেশ কথা বলিস।

সদানন্দ পা টিপতে থাকে।

—একটা সত্যি কথা শুনবি ?

—বলুন।

—তোকে প্রথম প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল তোকে দিয়ে আমি পা টেপাব।

পায়ের ওপর সদার হাতটা একটু থেমে যায়।

—আর তোকে ভালবাসব।

পায়ের ওপর সদার হাত আবার চলতে থাকে।

—তুই কি ভেবেছিলি ?

—আমি ভয় পেতুম।

—কেন ?

—কি জানি। ওসব ঠিক বুঝি না।

বেগম উঠে পড়ে। সদানন্দর দিকে তাকায়। সদানন্দের কালো মুখের দিকে তাকায়। গোল গোল ঠাণ্ডা চোখদুটোর দিকে তাকায়। কেমন একটু মায়া হয় যেন।

সদার কোলের ওপর শুয়ে পড়ে।

সদানন্দ এতটা ভাবতে পারেনি।

—মাথাটা একটু টিপে দে এবার।

চোখ বোঁজে বেগম।

বেগমের মুখের দিকে আবার তন্ময় হয়ে তাকায় সদানন্দ।

কোঁকড়া খুচরো চুল সরিয়ে দেয় কপালের ওপর থেকে। তারপর আস্তে আস্তে কপালটা টিপে দিতে থাকে। একবার আধবার ওর নরম গালের ওপর যখন ওর হাতের তালু লাগে, তখন যেন বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে ওর।

গালের ওপর হাত যেন আর না পড়ে এমনি সন্তর্পণে সদানন্দ ওর কপাল টিপে দিতে থাকে।

বেগম হঠাৎ হেসে ওঠে।

—একটা কথা মনে পড়ে হাসি পেল।

—কি ?

—বাবাকে যদি তোর নামে বলি, তুই আমার জন্যে পাগল হয়ে গেছিস। তোকে কি করবে জানিস ? জানিস না বোধহয় ?

—কি ?

—বেঁধে চাবুক মারবে। তোর কালো পিঠটা বেয়ে লাল টকটকে রক্ত গড়াবে। তুই মুখ গুঁজরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবি।

সদানন্দ এসব কিছুকে ভয় করে না। তার নিজের গায়ে শক্তিও কিছু কম নয়।

তাই একটু হেসে বলে—আমি জানি। আপনি বলবেন না।

—যদি কখনও বলি ?

—তখন আপনার বাবা আমার গায়ের শক্তি দেখে একটু অবাক হবেন। সরু লোহার শিকল আমি একটানে ছিঁড়ে ফেলতে পারি।

—সত্যি ! মন্দ লাগে না বেগমের। এমন বলিষ্ঠ ছেলেটাকে নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলছে ? ভাবতে বেশ লাগে। কত গায়ের জোর, কিন্তু বেগমের কাছে কত অসহায়। কত দুর্বল। বাইরে বাতাসের বেগ কমে আসছে। বৃষ্টিও কমে আসছে।

বেগম ওঠে—ঝড় কমে গেছে। এবার যাই।

বলে সদানন্দর চুলের গোছাটা ধরে ওর মুখটা তুলে একটু হাসল সেই মারাত্মক হাসি।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সদানন্দর শরীরটা জ্বলতে থাকে অনেক্ষণ ধরে। কিসের যে

জ্বালা ও বুঝতে পারে না।

বয়েসটা বড় বেশী হয়ে গেল। আর ঘরে রাখা চলে না। চলতি বিয়ের বয়েসে তালুকদার বেগমের বিয়ের কোন চেষ্টা করেন নি। ভেবেছেন এমনিতেই মেয়েটা একটু দামাল। দস্যিপনা করে বেড়ায়। আর একটু বয়েস হোক। বুদ্ধি একটু পাকুক। তারপর বিয়ে দেয়া যাবে। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে এতটা ছটফটানি নিশ্চয়ই থাকবে না।

কিন্তু ভুল করছিলেন তালুকদার।

অবাক হয়ে দেখছেন এখন যে বেগমের পরিবর্তন ত' দূরে থাকুক, ও একটু স্থির হতেও পারে নি বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে।

ধীর স্থির হওয়াই যে খুব ভাল একথা তালুকদার আজও বিশ্বাস করেন না। তবু বিয়ের চেষ্টা করতে গিয়ে দেখছেন যে এত উগ্র স্বভাব থাকলে বিয়ে হওয়া খুব বিপদের কথা হয়ে পড়ে।

বড় মুস্কিলে পড়েছেন তালুকদার।

এক একবার ভাবেন বেগমকে খুব জোরাল শাসন করবেন কিনা।

কিন্তু পারেন না। স্নেহের আতিশয্য শাসনের প্রয়োজনকে ডিঙিয়ে যায়।

তালুকদার নিতান্ত অসহায় ভাবে চুপ করে থাকেন।

ইদানীং আবার একটু বিয়ের চেষ্টা করছেন তালুকদার। একটা পাত্রের খোঁজও পেয়েছেন। ছেলেটির নিজের বলতে গেলে কেউ নেই। নির্ঝঞ্ঝাট। এ মেয়ে শ্বাশুড়ী ননদ নিয়ে ঘর করতে পারবে না, এ কথা হলপ করে বলা যায়। খুব বড় সংসারে এ মেয়ের বিয়ে দিলে উল্টে বিপদ হবে। সেদিক থেকে ছেলেটি বেশ।

এম, এ, পাশ। হেডমাষ্টারি করে গঙ্গার ওপারে বীরচণ্ডীপুরের

হাই স্কুলে। জায়গাটা ঠিক গ্রাম নয়। আধা শহুরে ভাব আছে। চারপাশে বহু গ্রামের মধ্যখানে এই বীরচণ্ডীপুর।

চাকরীটা তেমন ভাল নয়। মাষ্টারিতে ক'টাকাই বা পায়? তবে একটা কথা শুনেছেন তালুকদার। ও নাকি অনেক ভাল চাকরী পেতে পারত! কলেজে পড়বার সময় স্বদেশীর দলে ঢুকে বছর দেড়েক জেল খাটায় ভাল চাকরী ওর হয়নি। জেলখাটা ছেলের সরকারী চাকরী হওয়া ত' প্রায় নিষিদ্ধ বললেই চলে।

অন্য সব দিকে ছেলেটি নাকি ভাল। বয়েস বছর বত্রিশ। খুব আর বেশী কি।

সেদিন বিকেলে ছেলেটি নিজেই দেখতে আসবে জানিয়েছে। তালুকদার বেগমকে বলে রেখেছে যথারীতি, আজ যেন আর বেরোন না হয়।

বেশ কিছু দিন পরে আবার বিয়ের সম্বন্ধের কথা শুনে বেগম রীতিমত ক্ষেপে গেছে। বিয়ে করতে ওর মোটেই ইচ্ছে নেই। ভাবলেই যেন রাগ হয়।

তবু বাবার খুব ইচ্ছে তাই কিছু বলে না।

দুপুরে সদাকে বলে—বাবা আবার এক ফ্যাসাদ বাধিয়েছে।

—কি হ'ল আবার।

—বিয়ের ঠিক করছে।

সদা হাসে—ভালই ত'!

—তুই আচ্ছা বোকা। বিয়ের আমার কি দরকার শুনি। ভাল লাগে না।

সদার মুখটা একটু উজ্জ্বল হয়।

বেগম একটু ভেবে বলে—তুই একটা কাজ করতে পারবি?

—বলুন।

—লোকটাকে স্টেশন থেকে ভাগাতে পারবি?

—কি করে ভাগাব?

—গিয়ে একটা ধাক্কা মেরে বলবি গাঁয়ে ঢুকলে হাড় ভেঙে দেব।

সদানন্দ একটু চিন্তিত হয়—মিছিমিছি একটা লোককে—

—মিছিমিছি! উঃ! তোরা সব আমাকে তাড়াবার ষড়যন্ত্র করছিস। যা তোদের কাউকে কিছু করতে হবে না। বেগম ভীষণ রেগে যায়।

সদানন্দ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না যে মিছিমিছি একটা লোককে মারতে যাবে কেন? কি করে ও পারবে সেটা? একি কখনও হয়!

বেগম বেরিয়ে যায়।

আজও বিকেলের দিকে বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। অচেনা কোন লোক দেখলেই বুঝবে তাকে দেখতে এসেছে। দরকার হলে আজ মেরেই তাড়াবে।

রাগলে আর কোন জ্ঞানই থাকে না বেগমের। চিরটা কাল এমনি ধারা।

ভদ্রতা অভদ্রতা ভাল মন্দ কিছু ওর ধারণায় আসে না। রেগে গিয়ে যা করবে ভাবে, সেটা না করে ওঠা পর্যন্ত ওর স্বস্তি নেই।

ওই ত' আসছে। বেশ লম্বা চেহারাটা। পাতলা পাতলা শরীর, কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ মনে হয়। নাকটা বেশ উন্নত। কোঁকড়া চুল একমাথা। চুলে তেল নেই, আঁচড়ান নেই।

বেশ দ্রুত পা ফেলে হাঁটছে।

তাকাল বেগম।

লোকটা একবার তাকাল।

চোখদুটি বেশ বুদ্ধিদীপ্ত, উজ্জ্বল।

মুখভরা একটা প্রশান্তির ভাব। চওড়া কপালে সামান্য দুটো রেখা। মনে হয় যেন খুব চিন্তাশীল।

লোকটা কাছাকাছি আসতেই বেগম ডাকে—এই, শুনুন!

লোকটা তাকায়। প্রথমটা রীতিমত অবাক হয়।

এমন পরমারূপসী একটা তরুণী এ রকম নিঃসঙ্কোচে যে কোন লোককে ডাকতে পারে এটা ধারণা করা খুব শক্ত।

লোকটার মুখে হাসি খেলে যায়।

এগিয়ে যায়।

সরু গাছের একটা ডাল নিয়ে কন্টিকারি ঝোঁপে মারতে মারতে বেগম চোখ তুলে তাকায়।

বড় বড় চোখের বাদামি মনিছুটোয় ওর বিরক্তি আর তেজ।

—কোন বাড়ী যাবেন ?

লোকটা বলে—কেন বলুন ত' ?

বেগমকে 'আপনি' বলে লোকটা। বেশ ভদ্র ত' ?

তবু বেগম বলে—কোন বাড়ী যাবেন শুনি না ?

—এই বাড়ী। যদ্দুর শুনেছি তাতে এই বাড়ী বলেই মনে হচ্ছে ?

ওদের বাড়ীটাই দেখিয়ে দেয় লোকটি।

বেগম ডালটা বাতাসে ছুবার শাঁ শাঁ করে ছুলিয়ে বলে—কেন আমাকে দেখতে ?

প্রথমটা একটু অবাক হলেও পরক্ষণেই লোকটির চোখছুটিতে বুদ্ধির দীপ্তি খেলে যায়।

বেশ শান্ত ভাবে বলে—তবে ত' খুব সুবিধেই হ'ল। এখানেই দেখাশুনা হোক।

একটু গম্ভীর হয়ে বলে আবার—আপনার নাম কি ?

বেগম এবার একটু অবাক। বেশ ত'! লোকটা একটু ভাবলও না। চটলও না। বলে কিনা এখানেই দেখাশুনো হোক।

তাকায় ভাল করে। দেখে লোকটা মৃদু মৃদু হাসছে।

রাগে জ্বলে ওঠে বেগম।

বলে—আমার নাম বেগম। আমি দরকার হলে লাঠি চালাতে জানি।

বলে বেগম হাতের ডালটা শাঁ করে আর একবার বাতাসে দোলায়।

লোকটি হাসে—তবে ত' ভালই হ'ল। আমার ওদিকটা আবার চোর ডাকাতের ভয় আছে। কেউ আর এগোতে সাহস করবে না। রাঁধতে জানেন?

লোকটা তাকে বেশ বোকা বানাচ্ছে ত'? বেগম রেগে বলে—দেখুন, আমাকে বিয়ে করবার চেষ্টা করবেন না। আপনার ভিটেয় ঘুঘু চড়িয়ে দেব।

লোকটা তেমনি শান্ত স্বরে বলে—ঘুঘুর ডাক শুনতে আমার বেশ ভালই লাগে। সবই বেশ মিলে যাচ্ছে দেখছি।

—ধুত্তোর!—বলে বেগম হাতের ডালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হনহন করে চলে যায়।

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কপালে চিন্তার রেখা দেখা যায়। চুপ করে ভাবে। ভাবতে ভাবতে মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে।

এবার তালুকদারের দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়।

তালুকদার অপেক্ষা করছিলেন। সাড়া পেয়ে আদর করে ভেতরে এনে বসান। বাতাস করতে বলেন একটা চাকরকে।

—আসতে কোন কষ্ট হয়নি?

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন ভদ্রলোক।

তালুকদারের কথায় একটু চমকে তাকিয়ে হেসে বলে—না। কষ্ট আর কি!

—তবু গরমের দিন ত'? আচ্ছা আপনার বাপ মা ত' নেই?

—না।

—কে আছে আর?

—ছোট একটি ভাই আছে। সে জলপাইগুড়িতেই থাকে। চা বাগানের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার।

—বাঃ। বেশ কথা। আপনি বীরচণ্ডীপুরে একাই থাকেন ?

—হ্যাঁ।

—বাসা আছে ?

—হ্যাঁ। জমি কিনেছি একটু। বাড়ী করব ভাবছি।

—খুব ভাল। নিজের বাড়ী একটা না হলে কি আর—। কিছু ধেনো জমিও না হয় কিনে ফেলুন আস্তে আস্তে।

লোকটি হাসে—টাকা কোথা পাব ?

—সে হয়ে যাবে। ওখানকার জোতদারদের সঙ্গে আমার দহরম মহরম আছে। পরে ব্যবস্থা করে দেয়া যাবে।

এর ভেতর জলখাবার এসে পড়ে দু' থালা। বড় বড় দু'খানা রূপোর থালায়। একটায় ফল। আর একটায় মিষ্টি।

—এত কি হবে ?

তালুকদার হাসেন—বয়েসের সময় এটুকু আর খাবেন না ? কি বলেন ?

লোকটা হাসে—আমি খুব কম খাই ? তাছাড়া বেশী খাওয়াটা শরীরের পক্ষে ভাল, এ ধারণা আমাদের ভুল !

—কিযে বলেন ? আমার খাওয়া ত' দেখেননি ?

লোকটি হাসে। দুটো মিষ্টি আর এক গেলাস জল খেয়ে হাতটা মুছে ফেলে রুমালে।

তালুকদার এবারে ভয়ে ভয়ে বলে—তাহলে আমার মেয়েটিকে নিয়ে আসি।

লোকটি বলে—দরকার নেই।

তালুকদার একটু ঘাবড়ে যান। জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

লোকটি তালুকদারের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে—দেখা হয়ে গেছে আমার। রাস্তার পাশে বাগানের ধারে।

সর্বনাশ করেছে। তালুকদার একটা বড় নিশ্বাস ফেলেন। যা! বেগম বোধহয় আবার সব ভেস্তে দিয়েছে। নাঃ! মেয়েটাকে এবারে রীতিমত শাসন করতে হবে। তার সমস্ত চেষ্টা এমন করে বিফল করে দেয় বারবার। তালুকদার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

—শুনুন।

তালুকদার ফিরে তাকান।

লোকটি বেশ শান্ত স্বরে বলে—আপনার মেয়ের মত মেয়ে বাংলাদেশে দেখা যায় না। এমন মেয়ে অপছন্দ হবার কোন কারণই দেখছিনে।

হঠাৎ আনন্দে বসে পড়েন তালুকদার।

—হ্যাঁ—লোকটা গম্ভীর স্বরে বলে—বিয়েতে আমার আর কিছুই বলবার নেই। দেনা পাওনা সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলতে চাই না। দিনটা স্থির করে জানাবেন। আমার ভাই আর পিসীমাকে খবর দিতে হবে।

তালুকদার আনন্দের আতিশয্যে উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত দুটো চেপে ধরেন।

—তোমাকে কি আর বলব বাবা! তুমি দেখো আমি যথাসাধ্য খরচ করব। এই আমার একমাত্র মেয়ে। তুমি বলেছ ঠিকই। বেগমের মত মেয়ে দেখা যায় না। ও ভারী সরল। ওকে সবাই ঠিক চিনতে পারে না। তোমাকে আশীর্বাদ করছি বাবা। তুমি সুখী হবে।

লোকটি হাসতে হাসতে বলে—আচ্ছা। তবে চলি। একটা চিঠি পাঠাবেন।

বলে বেরিয়ে যায় লোকটি।

তালুকদার ভেতর বাড়ীতে গিয়ে দেখে বেগম একখানা ভাল সাড়ী পরে মঙ্গলার মায়ের কাছে চুপ করে বসে আছে। তালুকদার

সশব্দে ঘোষণা করে—বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তারিখটা ঠিক হলেই হয়ে যায়।

মঙ্গলার মা বলেন—কিন্তু মেয়ে দেখা ?

—বাগানের ধারে দেখেই পছন্দ হয়েছে। বললে এমন মেয়ে আর হয় না। জুটো দেখা যায় না।—বলতে বলতে বেগমের কাছে গিয়ে ওর পিঠে হাত রেখে আর্দ্রকণ্ঠে বলেন—এমন মেয়ে কি না পছন্দ হয়ে পারে ?

বেগম অবাক হয়ে কাঠের মত বসে থাকে।

লোকটা বেগমকে একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এই বেগমের প্রথম পরাজয়।

নিরঞ্জনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল বেগমের। বিয়ের আগের দিনও বেগম বহুবার ভেবেছিল। তার কি দেখে নিরঞ্জনের এত পছন্দ হ'ল ?

সেত' চূড়ান্ত অভদ্রতা করেছিল ওর সঙ্গে। ওকে তাড়াবার জন্যে রেগে গিয়ে কি না বলেছে।

নিরঞ্জন চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হেসেছে।

মানুষটা অদ্ভুত।

এতদিন যত মানুষ দেখে এসেছে বেগম। নিরঞ্জন তেমন নয়। ওকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ভাবতে হয়। ভাবলেও ঠিক বোঝা যায় না।

ওর বুদ্ধিদীপ্ত চোখদুটো আর হাসিটা রীতিমত অবোধ্য।

পছন্দ হ'ল না অপছন্দ হ'ল ? তাই বা কে জানে ?

শেষকালে বিয়ে করে জব্দ করবার চেষ্টা করবে না ত' ? তার চেয়ে আগে ভাগে পালিয়ে যাওয়া ভাল। সদার সঙ্গে রাত্রে পালিয়ে গেলে কেউ ধরতে পারবে না।

কিন্তু বাবার বড় লাগবে। বৃদ্ধ তালুকদারের কথাটা না ভেবে পারে না বেগম। বাবা ওকে কত ভালবাসে, সেটা ও বোঝে। বাবাকে এত বড় একটা আঘাত দিতে ওর কোথায় যেন একটু-খানি বাধে। বসে বসে ভাবে বেগম।

লোকটার চেহারাটা যে খুব মন্দ তা নয়। গায়ের রঙটা কড়া-পাক ঘিয়ের মত বাদামী। ঢোলা পাঞ্জাবীটা পরে যেন মানিয়েছিল।

সুতীক্ষ্ণ নাকের নীচে পাতলা দুটো ঠোঁট। চাপা, যেন একটা গভীর প্রশান্তি মাখা।

বেগম মনে মনে ভাবতে থাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

লোকটা নাকি এম, এ, পাশ। আবার স্বদেশী করত।

ভেবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না বেগম। কেমন যেন দুর্বোধ্য লাগছে। তার রূপ যৌবনের দিকে চোখ থাকলে পুরুষের চোখে যে লোভানি লক্ষ্য করছে বেগম, নিরঞ্জনের চোখে তেমন কোন লোভ ছিল না। বেশ মনে আছে বেগমের। তেমন কোন তন্ময়তা লক্ষ্য করেনি নিরঞ্জনের মুখে। তবু কেন যে সে বলে গেল—খুব পছন্দ হয়েছে।

একটু যেন ভাবনায় পড়ে গেছে বেগম।

বিয়ের আগের দিন সদার ঘরে গেছে গভীর রাত্রে।

সদানন্দ অপেক্ষা করছিল।

বেগম ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালে।

সদানন্দ বসে ছিল।

বেগম ম্লান হাসে—এখনও ঘুমোস নি ?

সদা তাকায় ওর দিকে। মুখটা ওর এত শুকিয়ে গেছে কেন কে জানে ?

সদানন্দর চোখের তলায় কালো ছাপ পড়েছে।

—তোর এমন চেহারা হয়েছে কেন রে ?

সদানন্দ মুখটা নীচু করে।

বেগম ওর কাছে এগিয়ে যায়।

সদানন্দ কি কাঁদছে ?

ফুলে ফুলে উঠছে ওর শরীরটা। সর্বাঙ্গ কাঁপছে বোধ হয়।

বেগম ওর মুখটা তুলে ধরে।

চোখের জলে গাল ভিজে গেছে সদানন্দর। জলে হু'চোখ তখনও ঝাঁপসা।

—কাঁদিসনি সদা। কাঁদিসনি।—ওর জন্যে একটু যেন মায়া হয় বেগমের।

নিজের সাড়ীর আঁচল দিয়ে ওর চোখের জল মুছিয়ে দেয়।

—কাঁদিসনি সদা। বিয়ে হলেই বা! বিয়ের পরে তুই আমার কাছে যাবি। কেউ কিছু বলতে পারবে না। আমার কথার ওপর এখনও কেউ কিছু বলে না। তখনও কেউ কিছু বলতে পারবে না। দেখিস। তেমন তেমন দেখলে অনর্থ ঘটিয়ে দেব। সব ভেঙেচুরে দিয়ে চলে আসব।

সদানন্দর কান্নার বেগটা কমে। কিন্তু কথা বলতে পারে না।

বেগম সস্নেহে ওর মাথার চুলের ভেতর আঙ্গুল বুলিয়ে দেয়।

সদানন্দ নীরবে সেই স্নেহের স্পর্শটুকু উপভোগ করে।

—রাত অনেক হয়েছে। শুয়ে পড় তুই। আমি যাই।

বেগম ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

নিরঞ্জনের ভাবনায় এই হু'চারদিন ওর ছটফটে ভাবটা যেন কেমন একটু মিইয়ে গেছে। ও নিজেই বুঝতে পারে। এটা ঠিক লজ্জায় নয়। ভয়ে নয়। একটা অহেতুক ভাবনায়। ভেবেও নিরঞ্জনের সম্বন্ধে কিছু একটা স্থির করে ফেলতে পারে না।

বিয়ে যথা সময়ে হয়ে যায়। বিয়েতে রীতিমত খরচ করেছেন

তালুকদার। খাট পালঙ্ক থেকে সুরু করে গয়নাপত্তর দিয়েছেন প্রচুর। থালা বাসন মায় পিকদানি পর্যন্ত দিয়েছেন। দেখে শুনে ধন্যি ধন্যি করছে সবাই।

তালুকদার হেসেছেন তৃপ্তির হাসি। এমন বিদ্বান ছেলে, কেন দেব না শুনি? এ দেয়াই ত' শেষ দেয়া নয়। যতদিন বেঁচে আছি ওরা পাবে আরও অনেক কিছু।

দোলে পাবে দুর্গোৎসবে পাবে। নাতি হলে···

বলতে গিয়ে তালুকদার খুব খুসী হয়ে হাসেন।

দু' একজন নিন্দুক বলতে ছাড়ল না। ছেলের অবস্থা তেমন ভাল নয়।

উত্তর দিলেন তালুকদার। ছেলে ভাল হলে অবস্থা ভাল হতে কতক্ষণ। আর ছেলে খারাপ হলে ভাল অবস্থাও দু'দিনে খারাপ হয়ে যায়।

তা বটে! নিরঞ্জনকে দেখে সবাই একবাক্যে বলল। যেমন লম্বা তেমনি সুশ্রী। একটু যা গম্ভীর।

তা'হোক। মেয়ে যা তড়বড়ে ছেলে একটু গম্ভীর-সম্ভীর হওয়াই ভাল।

বিয়ে চুকে গেল।

বাসর রাত কেটে গেল।

পাড়ার মেয়েরা এল ঝেঁটিয়ে। নিরঞ্জনকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে সুরু করল। নিরঞ্জন দু' চারটে কথার জবাব দিল মাত্র।

বেগম কিন্তু হাসতে লাগল। বকবক করল খুব।

রাত বাড়বার পর বাসর প্রায় ভেঙে এলো। মেয়েগুলো ঢলে পড়ল এখানে ওখানে ছড়িয়ে। বেগম শুয়ে পড়ল। শুয়ে ঘুমিয়েও পড়ল। নিরঞ্জন জেগে ছিল শুধু।

বাসি বিয়ের পর নিরঞ্জনদের বাড়ী যেতে হবে।

এ সময়টা অনেকেই যা আশা করছিল, তা কিন্তু হ'ল না।

সবাই ভেবেছিল বাপের আদুরে মেয়ে। একমাত্র কন্যা। নিশ্চয়ই খুব কান্নাকাটি করবে। যেতে চাইবে না।

বাপের অবস্থা নিশ্চয়ই খুব কাহিল হবে।

কিন্তু আশ্চর্য!—বলল পাড়ার মেয়েরা—একটু কাঁদল না গা! কি আদিখ্যেতা! যার কাছে জন্মভর মানুষ হলি, তার জন্যে একটু মায়া হ'ল না গা!

আজকাল অবিশ্যি এমন ধারা হয়েই থাকে।

তালুকদার কাঁদলেন না। যাবার সময় কাছেও এলেন না। বোধহয় বাইরের ঘরে বসে তামাক খেতে খেতে চোখ মুছছিলেন।

বেগম আর নিরঞ্জন প্রণাম করতে এলো।

শুধু বললেন—মনু তোর সঙ্গে যাবে।

বেগম বলল—আমাকে আনতে সদাকে পাঠিও বাবা।

—পাঠাব।

তালুকদার মুখ ঘোরালেন।

ওরা বাইরে চলে এলো। বেগমের মুখে একটু ভয় নেই, একটু বেদনা নেই। এ যেন একটা নতুন খেলা ওর কাছে। বেশ ভালই লাগছে। বেশ মজা লাগছে।

একজনের কথা শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়ছে। মায়ের কথা। মায়ের পাণ্ডুর মুখখানা কেন যে আজ বারবার মনে পড়ছে।

তবু বেগমের চোখে জল আসে না। কেন যে আসে না কে জানে!

শৈশব থেকেই কোন বিপদে বা আশংকায় ও রেগে যায়, তার সঙ্গে লড়াই করে। কাঁদতে পারে না। কাঁদতে জানে না।

নিদারুণ কষ্টে ওর চোখ দুটো জলে ভরে ওঠে না। বাদামী মণিদুটো ঝিকমিকিয়ে ওঠে ছুরির ফলার মত। এমনি অদ্ভুত ওর ভাব-সাব।

কেন যে এমন হয়। ও জানে না। ও বুঝতে পারে না।

একবার মনে ভাবে। সবাই ত' এ সময় কাঁদে, ওরও কাঁদা উচিত ছিল। কিন্তু জোর করে কি আর কাঁদা যায়।

মনু ওদের সঙ্গে গেল। দিদির শ্বশুর বাড়ী। আবার আটদিন পরে সদা যাবে। বেগম আর নিরঞ্জনকে নিয়ে ওরা সবাই ফিরবে। আটদিনের মাথায় নাকি ফিরতে হয়।

নিরঞ্জন স্টেশনে গিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটল ওদের জন্যে।

আর মনুরা ইণ্টার ক্লাস।

না। তা হবে না। নিরঞ্জন বাধা দিল।

টিকিট নিয়ে বদলে সব ক'খানাই ফার্স্ট ক্লাশ করে আনল নিরঞ্জন।

একটা কামরাতেই উঠল সবাই।

বেগম চুপ করে বসে রইল, চুপ করে বসতে ওর অত্যন্ত কষ্ট হয়। তাই মাঝে মাঝে শুধু এপাশ ওপাশ করছিল।

মাঝে একটা ষ্টেশনে মনুকে বলল—এই মনু।

মনু তাকাল।

—ওই কচুরি-টচুরি কিছু কিনে নিয়ে আয় না?

মনু কিছু বলবার আগেই নিরঞ্জন বললে—না। এগুলো পেটের পক্ষে খুব খারাপ। তারচেয়ে বরং খাবারের গাড়ীতে অর্ডার দিয়ে এসো, ডিম রুটি আর চা।

—ওসব আমি খাব না। ঠোঁট ফুলে ওঠে বেগমের।

মনু একটু থতমত খেয়ে যায়।

নিরঞ্জন হাসে। মনুর দিকে তাকিয়ে বলে—রাগ অনেক সময় মানুষের উপকার করে, জান মনু? এ সব জায়গায় কিছু না খাওয়াই বরং ভাল।

বেগম অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকে।

মনু একবার আস্তে আস্তে বলে—দিদির বোধহয় খিদে পেয়েছে। বারে বারে খাওয়া অভ্যেস কিনা?

—তাই নাকি ?

বেগম মনুর দিকে বড় বড় চোখে তাকায়।

নিরঞ্জন গাড়ী থেকে নেমে যায়।

একটু পরেই বয় ট্রেতে করে দু'খানা মাংসের কাটলেট আর রুটি নিয়ে আসে।

নিরঞ্জন বেগমের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দেয়।

বেগম তাকায়। ওর দেখতে বেশ লাগে। পরিস্কার ট্রেতে পরিস্কার ধবধবে ডিসে কি সুন্দর ভাজা। রাগটা পড়ে যায় বেগমের।

ফিক করে হেসে মনুকে বলে—তোরা খাবি না ?

—দাদাবাবু কি খাবেন ? মনু জিজ্ঞাসা করে।

—না।—বলে নিরঞ্জন চা আনতে বলে দেয়।

বেগম আর মনু ভাগাভাগি করে খেয়ে নেয়। বেগমের ঝাল লেগেছে। রাঙা ঠোঁটদুটো ছুঁচোল করে শুষতে থাকে ও।

নিরঞ্জন তাকিয়ে দেখে। ওর ছেলেমানুষি ভাব দেখে একটু হাসে।

চা আসে এবার। নিরঞ্জন এক পেয়ালা চা খায়।

বেগমও চা খায়। মনু খায় না।

—চা খাওনা তুমি ?

—না। মাষ্টারমশাই বকেন।

—মাস্টারমশাই কে ?

—দেখেন নি ? ওই যে কালো মত। পরিবেশন কচ্ছিলেন। সদানন্দ।

নিরঞ্জন বলে—ভাল মনে নেই, তবে তোমাদের মাস্টারটি বেশ ভালত' ?

—হ্যাঁ, খুব চমৎকার।

—তুমি এখন কোন ক্লাসে পড়ছ ?

—এইটে।

—কি রকম নম্বর পাও ?

—ফার্ষ্ট হয়েছি এবার।

—বাঃ! খুব ভাল। তোমার দাদা ?

—ও তেমন ভাল নম্বর পায়নি, ক্লাসে উঠতে পারেনি

—ও। আর তোমার দিদি ?

মন্নু অবাক হয়ে বলে—দিদি ত' পড়ত না ?

নিরঞ্জন হাসে—তাই নাকি ? এইবারে তবে পড়তে হবে।

বেগম চোখ বেঁকিয়ে তাকায়!

নিরঞ্জন মৃদু মৃদু হাসে।

ওরা এসে পৌঁছল নিরঞ্জনের বাসায়। সেখানে ভাই ছিল, পিসীমা ছিলেন। আরও দু' চারজন আত্মীয় ছিলেন। স্ত্রী আচার-গুলো তাঁরাই করলেন।

বিকেলের দিকে নিরঞ্জন বেরিয়ে যায় ওর স্কুলে দু' তিন-দিনের কাগজ পত্র কি জমে আছে দেখতে। স্কুল থেকে ফেরে রাত্তিরে।

পরদিন বৌভাত। নিরঞ্জনের স্কুলের কয়েকজন মাস্টার ছাত্ররা মিলে খেটেখুটে সব জোগাড় করে দেয়। নিরঞ্জনকে বিশেষ কিছু করতে হয় না

নিরঞ্জন শুধু টাকাটা দিয়ে দেয় ওদের।

ওর ভাই ভাল চাকুরে। সে-ও এ ব্যাপারে প্রায় শ'তিনেক টাকা খরচ করে। বিশেষ করে বৌদিকে তার বেশ ভাল লেগেছে। বৌদির হাসি বৌদির চেহারা সবই।

তবে ও কথা একটাও বলেনি বৌদির সঙ্গে। এমনিতেই একটু লাজুক প্রকৃতির ছেলে। অত্যন্ত কম কথা বলে। নিরঞ্জনের চেয়েও কম।

এক আধবার দু' একটা কথা বলবার ফুরসত খুঁজেছে, কিন্তু

ফুরসত পায়নি। মনে মনে ভেবেছে বৌদির সঙ্গে আলাপ না করে যাওয়া চলবে না। ছুটি বাড়িয়ে নিতে হবে। তাতে যদি ম্যানেজার একটু চটেন, চটুক।

বৌভাত উৎসব বেশ ভাল ভাবেই মিটেছে। তালুকদারের ওখান থেকে কেউ আসেনি। মনু ত' আছেই, ওতেই হবে।

এ জায়গার সবাই বেগমকে দেখে বিমুগ্ধ চোখে প্রশংসা করে গেছে। এমন রূপ বড় একটা দেখাই যায় না।

স্টেশনমাস্টার, পোস্টমাস্টার, ডাক্তারবাবু, স্কুলের সেক্রেটারী যত গণ্যমান্য লোক ছিল সবাই। এক এক জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে নিরঞ্জন। কারো দিকে বেগম বড় একটা তাকাচ্ছেই না। যারদিকে ও টানাটানা চোখদুটো তুলে তাকিয়ে একবার ফিক করে হেসে ফেলছে, তার সে রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

ডাক্তারবাবু ত' উচ্ছ্বসিত। বিউটিফুল। অপূর্ব। হেড-মাস্টারমশায়ের চয়েসকে বলিহারী যাই। ওয়াণ্ডারফুল। ইউনিক।

ইংরেজীর কোন বিশেষণই আর বাদ রাখলেন না ডাক্তারবাবু।

স্টেশনমাষ্টার একটু বয়স্ক। বললেন—ঠিকই বলেছেন ডাক্তার বাবু। এমন চটকদার সুন্দরী চোখে পড়ে না। তবে ··।

ডাক্তার বললেন—চটকদার মানে? হোয়াট্ ডু ইউ মিন্? অপ্সরীকে বলে ওদিকে থাক। এমন সুন্দরী আমার চোখে পড়েনি আজ পর্যন্ত! কি যে ইয়ে বলেন আপনি?

স্টেশন মাষ্টার হাসেন—তা বটে! কিন্তু কি জানেন, আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, বেশী রূপ থাকলে সুখী হয় না। সংসারে আগুন জ্বলে যায়।

ডাক্তার খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটছিলেন। বললেন—তা যায় যাবে। তবু আগুন ত' বটে। এ আর সেই আপনার গিয়ে ইয়ে নয়।

যে যাঁর ঘরে চলে যান। কারো কারো নিরঞ্জনের ভাগ্যকে ঈর্ষা করে বুক জ্বলে, কারো বা বেগমের হাসি আর চাউনি ভুলতে রাত তিনটে বেজে যায়। মোদ্দা, স্থানটিতে স্থানীয়দের মধ্যে একটু বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

হ্যাঁ! নিরঞ্জন বিয়ে করছে বটে। দেখবার মত বউ!

রাত গভীর হয়ে আসে। ফুল ছড়ান বিছানায় আজ প্রথম বেগম স্বামীর সঙ্গে এক ঘরে শুতে আসে। কোন পুরুষের সঙ্গে একা একঘরে রাত কাটান এই প্রথম। তবু বেগম কিছু মাত্র গ্রাহ্য করে না ব্যাপারটাকে।

ভয় আর লজ্জা এ দুটো ওর মনে নেই। হয়ত তাই হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে।

নিরঞ্জন আগে থেকেই বসেছিল খাটের ওপর।

বেগম নিরঞ্জনের দিকে তাকায়। তেমনি তেরছা তাকানি, চোখে বাদামী ঝিলিক।

নিরঞ্জন লক্ষ্য করে। মনে মনে একটু হাসে শুধু।

বেগম খাটের ওপর এসে কাত হয়ে শুয়ে পড়ে।

দোরটা বন্ধ করা হয়নি।

নিরঞ্জন গিয়ে আস্তে আস্তে দোরটা বন্ধ করে দেয়। বেগম তাকায় আর হাসে। ঘোমটা খুলে ফেলেছে বেগম। একটা তাজা বেল ফুল হাতে নিয়ে পিষে ফেলে দেয়।

নিরঞ্জন লক্ষ্য করে।

একটু হেসে বলে—একগাছা লাঠি এনে রাখব ঘরে?

এই প্রথম কথা ফুলসজ্জার রাত্রে।

বেগম ফিক করে হেসে ফেলে।

নিরঞ্জন আবার বলে—ঘুঘুর ডাক শুনতে আমি খুব ভালবাসি। কবে ঘুঘু পাখী আসবে?

বেগম এবার খোঁচাটা বুঝতে পারে।

মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে। চোখ দুটো ঝিকমিক করে।

তক্ষুনি তক্ষুনি কোন উত্তর জোগাতে পারে না।

নিরঞ্জন হাসতে হাসতে এসে ওর পাশে বসে।

—খুব রাগ হচ্ছে আমার ওপর, না?

—হচ্ছেই ত'।

—তাহলে কি করা যায় বলতো? ধমকেও বিয়েটা আটকাতে পারলে না?

—বিয়ে আটকাতে পারতুম। ইচ্ছে করেই আটকাই নি।

—কেন?

—ঘুঘু চরাব বলে।—বেগম হেসে ফেলে।

নিরঞ্জন চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। অনেক্ষণ কি যেন ভাবে।

তারপর শান্ত স্বরে বলে—তুমি আমার কাছে পড়বে রোজ?

বেগম কথাটার ঠিক মানে বোঝে না।

হাল্কা স্বরে বলে—বিয়ের পর আবার কেউ পড়ে নাকি?

—সবাই পড়ে না। কিন্তু তুমি ত' সকলের মত নও। তোমার ভেতরে একটা মাত্র অভাব আছে। সেটা আমি পূরণ করে দিতে চাই। তাহলে তোমাকে দিয়ে অনেক বড় কাজ হতে পারবে।

—বড় কাজ আবার কি?

—সেইটেই ত' জান না। আমি সব বলে দেব। তোমায় সব জানাব। শেখাব।

বেগম কথাগুলো ঠিক ধরতে পারছে না।

একটু ভেবে বলে—ও সব আমার ভাল লাগে না।

—কি?

—এই পড়া-টড়া।

—কি ভাল লাগে?

বেগম উত্তর দিতে পারে না চট করে।

একটু কেমন যেন হয়ে যায়। নিরঞ্জনের চোখেও একটুও

লোভ দেখতে পায় না। ভেবেছিল নিরঞ্জন ঘরে ঢুকেই তার কাছে আসবে। তার যৌবন রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে লোভীর মত তাকাবে। আর ও আজ রাত্রটা ইচ্ছে মত খেলবে ওকে নিয়ে। যা বরাবর ও করে এসেছে। এতে একটা আরাম আছে। মজা আছে।

প্রথমে ঘরে ঢুকেই তাই ও হেসেছিল। এক বিশেষ অর্থপূর্ণ ভাবে চোখ বেঁকিয়ে তাকিয়েছিল। কিন্তু এগুলো যেন নিরঞ্জনকে ছুঁতেই পারল না।

নিরঞ্জন সব ভেস্তে দিয়ে কি যে সব কথা বলতে সুরু করে দিল।

বেগম সাড়ীর আঁচলটা আলগা করে দিল।

তাকাল একবার নিজের যৌবন পুষ্ট দেহটার দিকে। তারপর আবার হাসল নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে। এ হাসি যে কোন পুরুষের পক্ষেই মারাত্মক।

নিরঞ্জন তাকিয়ে রইল শুধু। চোখের গভীর প্রশান্তিতে একটুও ঢেউ উঠল না।

খুব শান্ত স্বরে বললে—তুমি খুব সুন্দরী, না ?

—তোমার কি মনে হয় ?

—আমার ?—নিরঞ্জন একটু থামে। তারপর ধীরে ধীরে বলে—সৌন্দর্য কোথায় থাকে জান ?

বেগম প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে যায়।

নিরঞ্জন বলে—দেহে নয়, মনে আর ভালবাসায়। ভালবাসায় যে কোন মানুষ পরম সুন্দর হয়ে ওঠে। আর দেহের রূপ যেটা ওটা কি করে জান ?

বেগম আস্তে আস্তে বলে—কি ?

—ওটায় ভালবাসা আসে না। শুধু আনে জ্বালা।

কথাগুলো একেবারে নতুন লাগছে বেগমের। এ ধরণের কথা ও জীবনে কখনও শোনেনি।

লোকটির কথাগুলো যেমন ঠাণ্ডা। মানুষটাও তেমনি শান্ত।

তুর! এমন ভিজে ন্যাতার মত মানুষ! স্যাঁতসেতে শ্যাওলার মত।

বেগম বিরক্ত হয়। কথাগুলো নতুন লাগছে বলে জিজ্ঞেস করে—কিসের জ্বালার কথা বলছ?

—বিকারের জ্বালা।

নিরঞ্জন হেসে ফেলে এবার—যাকগে। পরে তোমাকে আরও বুঝিয়ে বলব। এই কথাগুলো ঠিক পরিষ্কার বুঝতে পারলে তুমি অপরূপ হয়ে উঠবে।

নিরঞ্জন ওর হাতটা ধরে কাছে টেনে আনে।

বেগম কাছে আসে কিন্তু নিরঞ্জনকে উত্তাপে পুড়িয়ে দিতে পারে না! জ্বালিয়ে দিতে পারে না।

এই প্রথম বেগম একজনকে দেখল যে ওর এতকাছে এসেও জ্বালায় না। জ্বলে না।

এই প্রথম পতঙ্গ যে ওর রূপের আগুনে পুড়তে ঝাঁপিয়ে পড়ে না।

বেগম অবাক হ'ল। বিরক্ত হ'ল। কিন্তু রাগতে পারল না। মনে মনে এটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছে ও নিরঞ্জনের ওপর রাগবার কোন উপায় নেই। রাগের কথা বললে যে হাসে, তার ওপর রাগ হলেও রাগ দেখাবার উপায় থাকে না।

বীরচণ্ডীপুরের দিকে দিকে উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল। নিরঞ্জনের বিয়েটা বেশ একটা উত্তপ্ত আলোচনার বস্তু হয়ে উঠল। স্টেশনে, পোস্টাফিসে, ডিসপেন্সারিতে, বারোয়ারী তলায় বেশ কথা কাটাকাটি চলল।

বীরচণ্ডীপুর স্থানটি ছোট হলেও বেশ উন্নত। সুরকির রাস্তা

চলে এসেছে স্টেশন থেকে সোজা বাজার অবধি। দুধারে বেশ ঘন বসতি। মাঠঘাট ডোবা খুব কম। থাকলেও আশে পাশের গ্রামে ছড়িয়ে আছে। ঝোঁপ জঙ্গল খুব কম। বড় বড় বাগান আছে কতকগুলো। তাছাড়া আছে ফুলবাগান। অনেকের বাড়ীর সামনেই একটু করে বাগান। বাসীন্দারা শিক্ষিত, পয়সাও আছে। কয়েকজন কারবারি মানুষ থাকাতে জায়গাটার এত উন্নতি। তাছাড়া আরও অনেক মানুষ আছেন। যাঁরা কলকাতায় ভাল চাকরি করেন। পরিবার এখানে থাকে, আশে পাশে জমিজমাও আছে, তাঁদের তাতে করে বেশ চলে যায়। সপ্তাহে একবার অথবা ছুটিতে আসেন এখানে।

এখানকারই হাইস্কুলের হেডমাস্টার নিরঞ্জন। এ চত্বরের মানুষ প্রায় সবাই নিরঞ্জনকে এত ভালবাসে যে অনেক সময় সামান্য ঝগড়াঝাটিতে নিরঞ্জনকেই ওরা রায় দিতে বলে। নিরঞ্জন যা বলে তাই হয়।

এ ছাড়া সবপালপার্বনে সকলের বাড়ী থেকেই নেমন্তন্ন হয় নিরঞ্জনের। নিরঞ্জনও সকলকেই খুসী করতে চেষ্টা করে।

ওর সবচেয়ে বড় গুণ ওর মত মিষ্টিকথা বলতে আর কেউ পারে না। যে কোন অতি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনায় এত শান্তভাবে কথা বলতে আর কাউকে দেখা যায় না।

ওর বিয়েতে তাই সকলেই এসেছিল কিন্তু বেগমকে দেখে একটু বিচলিত হ'ল। ওরে বাপ্! এত সুন্দর! গ্রামে ত' এর জুড়ি নেই!

নিরঞ্জনের কানে কিছু কিছু কথা এলো। ও শুনে হাসল শুধু। নীরবে নিজের দৈনন্দিন কাজ করে চলল।

এর ভেতরেই আর একবার বেগম বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে এসেছে। সদা এসেছিল নিতে। নিরঞ্জনকেও যেতে হয়েছিল একদিনের জন্যে।

সদা ছেলেটিকে নিরঞ্জনের বড় ভাল লাগল। শান্ত বলিষ্ঠ ছেলেটি। একটু বোকা বোকা। তা'হোক ছেলেটা ভাল।

—তুমিই বুঝি মনুদের মাষ্টার?

—আঁজ্ঞে হ্যাঁ।—বলল সদা।

—বেশ। তুমি নিজে কি পড়ছ?

—এবারে আর একবার ম্যাট্রিক দেব।

—আগের বারে বুঝি পার নি?

—না।—সদা একটু লজ্জিত হয়ে বলে। ও শুনেছিল নিরঞ্জন এম, এ, পাশ। ভেবেছিল বোধহয় খুব দেমাক হবে। তার সঙ্গে হয়ত ভাল করে কথাই বলবে না। কিন্তু নিরঞ্জনের কথাগুলো এত ঠাণ্ডা আর মিষ্টি যে সদা মুগ্ধ হয়ে গেল।

—তুমি কিসে কাঁচা?

—ইংরাজীতে।

—অ!—হাসল নিরঞ্জন—তুমি যদি মাঝে মাঝে এখানে আসতে পার। আমি তোমায় ইংরেজীটা দেখিয়ে দিতে পারি। প্রশ্নের উত্তর শেখবার কতকগুলো রীতি আছে। সেগুলো তোমায় দেখিয়ে দিলেই তুমি পারবে।

সদা খুসীতে ভরে উঠল।

ঘাড় নেড়ে বললে—তবে ত' আমার খুব ভালই হ'ল।

নিরঞ্জন হাসল।

সদানন্দ বেগমকে বললে—উনি বলছিলেন, এখানে মাঝে মাঝে এসে থাকতে। ইংরেজীটা বুঝে নিতে।

বেগম ঠোঁট ওল্টাল—ইংরেজী ওই বুঝি খুব ভাল জানে?

সদানন্দ জিভ কামড়ে বলে—কি যে বলেন। উনি ইংরেজীতে এম, এ, পাশ। কি সুন্দর মানুষ। একটু অহঙ্কার নেই।

বেগম জ্বলে উঠল—গ্যাখ সদা, যা জানিস না বলিসনি। ও একটা মিটমিটে শয়তান। মুখ ওমনি মিষ্টি, ভেতর একবারে—।

—ভেতরে কি ?

—জানিস না। যা বাজে বকিসনি।

—তবে কি আমি আসব না ?

বেগম বলে—আসবি বই কি। আমার কাছে বসবি গল্প করবি। তুই আমার লোক। ওর সঙ্গে তোর সম্পর্ক কি ?

—তবে কি বলছেন, ওর কাছে পড়ব না ?

—ইচ্ছে হয় পড়বি। না ইচ্ছে হয় পড়বি না। সেটা আমাদের ইচ্ছে। ওর ইচ্ছে নয়। তোতে আর ওতে কত তফাত। তুই কত ভাল। ওই জন্যেই ত' তোকে অত ভালবাসি।

দরজার দিকে একবার উঁকি দিয়ে দেখে নেয় সদানন্দ। তারপর হাসে।

পানের বাটার সামনে বসেছিল বেগম খাওয়ার পর। পান খেয়ে ঠোঁটদুটি টুকটুকে লাল করেছে। চোখে রয়েছে তখনও বাসি কাজলের রেখা।

সদা তাকিয়ে থাকে।

—পান খাবি ?—বেগম ফিক করে হেসে ফেলে ওর তাকানি দেখে।

—খাব। দিন।

বেগম ওকে একটা পান সেজে দেয়।

—শোন। তুই ত' আজ চলে যাবি। আবার সামনের শনিবার আসিস। রববার থেকে যাবি। মনুকেও আনতে পারিস। আর নয় থাক। দরকার নেই একাই আসবি।

সদানন্দ পানটা হাতে নিয়ে বাইরে যায়।

পানটা খেয়ে ওর মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। অত কালো রঙের মুখে পান খেলে ওকে বিশ্রী দেখায়।

সদা চলে যাবার পর ঘরে ঢোকে নিরঞ্জনের ভাই, সঞ্জয়।

—বৌদি একটা পান দিন।

—বসুন, বোস ঠাকুরপো।—পান খাওয়া লাল ঠোঁটে হাসে বেগম—আমার আবার কি জানেন আপনি-টাপনি বলা ঠিক পোষায় না।

—বেশ ত' তাতে কি ?—জমিয়ে বসতে বসতে বলে সঞ্জয়।

পান সাজতে সাজতে বেগম বলে—ছুটি বুঝি আবার বাড়িয়ে নিলে ?

একটু লজ্জিত হয় সঞ্জয়। কেন কে জানে।

বলে—হ্যাঁ। আরও পনের দিন।

একমাসের ওপর এখানে রয়েছে সঞ্জয়। কেন যে রয়েছে বুঝতে পাচ্ছে না। কিছুতেই এ জায়গা ছেড়ে আর যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। বেগমের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে। বেগমকে দেখতে ভাল লাগছে। বেগমের কাছে বসতে ভাল লাগছে।

কি যে একটা আকর্ষণ আছে বৌদির !

অবাক হয় সঞ্জয় ভাবতে ভাবতে। দাদাকে ও অসাধারণ শ্রদ্ধা করে। সম্মান করে। বৌদির সম্বন্ধে কোন অনেয্য ভাব সে মনের ধারেকাছেও আসতে দেয় না। ভাবে, বৌদির সঙ্গে একটু ঠাট্টা মস্করা এতে কি আর অন্যায়। তাছাড়া মা মরে যাবার পর বাড়ীতে এই প্রথম নারীর আবির্ভাব। তাই হয়ত ওর থাকতে এত বেশী ভাল লাগছে।

—কেন আবার ছুটি বাড়ালে ঠাকুরপো ? বৌদি হাসছে। টানাটানা চোখদুটো মেলে তাকাচ্ছে। কি অপরূপ চোখদুটো।

সঞ্জয় তক্ষুনি কোন উত্তর দিতে পারে না।

একটু ভেবে নিয়ে ঠাট্টার স্বরে বলে—আপনার জন্যে।

—ওমা !—চোখদুটো ডাগর ডাগর করে বলে বেগম—আমার জন্যে এত ? লোকে শুনলে বলবে কি ? তারচেয়ে বরং একটিকে সাতপাক ঘুরিয়ে নাও না ?

সঞ্জয়ের হাতে পান দেয় বেগম।

সঞ্জয় হাসতে হাসতে বলে—দেখুন না। আপনার মত একটি মেয়ে। ঠিক বিয়ে করব।

—আমার মত কোথায় পাব ? আমার চেয়ে যদি ভাল হয় ?

সঞ্জয় হাসে—কি যে বলেন আপনার চেয়ে ভাল ?

—তুমিই বা কি বলছ শুনি, আমি বুঝি খুব সুন্দর ?

—সুন্দর নয় ? আয়নাটা আনব ? দেখবেন ?

—আমি সুন্দর হলে আর তোমার কি লাভ বল। দেখি যদি তোমার জন্যে একটি জোটাতে পারি।

—আপনি সুন্দর হলেও আমার লাভ। বলতে পারব বুক ফুলিয়ে মানুষকে। আমার বৌদির মত রূপসী দেখা যায় না।

বেগম সঞ্জয়ের ওপর খুব খুসী হয়। ছেলেটি বড় ভাল। খিলখিল করে হেসে ওঠে। সঞ্জয়ের পিঠে একটা চিমটি কেটে চাপা গলায় বলে—কি বাজে বকছ !

তারচেয়ে তোমার জলপাইগুড়ির শিকারের গল্প বল। শিকারের গল্প শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। আরও ভাল লাগে তোমার মুখে।

সঞ্জয় বলে—বলছি। কিন্তু দাদাকে বলবেন না যেন। দাদা শিকার করা পছন্দ করে না। আমি শিকারে যাই শুনলে দাদা ভীষণ রেগে যাবে।

—দাদাকে বুঝি খুব ভয় কর ?

—তা করি। তাছাড়া দাদা ঠিক কথাই বলে। একটা জানোয়ারকে প্রাণে মেরে আনন্দ পাওয়া এটা আনন্দের বিকার ছাড়া আর কিছু নয়।

—আমার ত' জানোয়ার মারতে খুব ভাল লাগে। মানে ভাবতেই বেশ ভাল লাগে। তোমার দাদার ওসব বাজে কথা। সবেতেই বাড়াবাড়ি।

সঞ্জয় বলে—না। আপনি জানেন না। দাদা সব জিনিষেরই

ভেতরটা দেখতে পায় চট করে। যে কোন কাজ বা কথার মুলে কারণটুকু চট করে বার করে ফেলে। আমার কিন্তু বৌদি মাঝে মাঝে কষ্টও হয়। একটা হরিণকে হয়ত পায়ে বুলেট মেরে আধমরা করে রেখেছি। ছটফট্ করছে। বড় বড় টানাটানা চোখদুটো জলে ভরে উঠছে। আমি নিজে দেখেছি হরিণকে কাঁদতে।

বাঃ! বেশ মজা ত'!—শুনতে শুনতে বেগমের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।—তারপর বল।

—কি আর বলব। হরিণটা যখন মরে গেল তখনও তার চোখের কোলে স্পষ্ট জলের দাগ দেখেছি। এগুলো আর যারা শিকার করতে যায় তাদের নজরে পড়ে না। আমার নজরেই পড়ে। দাদা শুনলে ভীষণ রেগে যাবে।

বেগম বিরক্ত হয়—তোমার ওই এককথা। দাদা রেগে যাবে। রাগবে ত' বয়ে গেল।

সঞ্জয় খুব জোরে হেসে ওঠে। বাব্বা! দু'দিনেই এই!

বেগমও হাসিতে যোগ দেয়।

সঞ্জয় একটা সিগারেট ধরায়। তারপর বেগমকে শিকারের গল্প শোনায়। নিরঞ্জন স্কুল থেকে ফিরবে বিকেলে! এখনও অনেক দেরী। বাড়ীত কেউই নেই।

পিসীমা দিনকতক আগে চলে গেছেন তার স্বামীর কাছে। রাধুনি ঝি চলে গেছে কাজ সেরে। আবার আসবে বিকেলে।

বাড়ীতে রয়েছে সঞ্জয় আর বেগম। সদা ছিল। সদা চলে গেছে আজকের ট্রেনে।

বিকেল পর্যন্ত নির্বিঘ্নে গল্প করা যাবে। তারপর ঝি আসবে, রাঁধুনি আসবে।

নিরঞ্জন এলে জলখাবার হবে, চা হবে। দু' ভাই খাবে। তারপর বেগম খাবে।

বিকেলের খরচার টাকা ঝিয়ের কাছে দিয়ে একটু সময় থেকে নিরঞ্জন যাবে বাইরের ঘরে। তারপর ছাত্র আসবে সব। তাদের পড়াবে, বোঝাবে। রাত বাড়বার আগেই যাবে একটা মেয়েকে পড়াতে। ফিরবে রাত দশটা। এসে দুটিখানি খেয়ে শুয়ে পড়বে।

এসে হয়ত দেখবে বেগম ঘুমুচ্ছে। বেগমকে ডাকবে। বেগম জেগে থাকবে তবু উঠবে না। জোরে ধাক্কা দেবে গায়ে। তাতেও বেগম চোখ বুজে থাকবে।

দু'খানা হাত ধরে জোর করে ওঠাতে গেলে বেগম জড়িয়ে ধরবে ওকে। হাসবে খুব।

নিরঞ্জন একটু অপ্রস্তুত পড়ে বলবে—ছাড়। সঞ্জয় রয়েছে বারান্দায়।

—থাক।—বলে বেগম ছাড়বে না।

রাঁধুনির গলার আওয়াজ পেয়ে ছেড়ে দেবে। রাঁধুনি এসে জানাবে ভাত দেয়া হয়েছে।

ভাত খেয়ে এসে শুয়ে পড়বে নিরঞ্জন। রাত্রে বেগম বিরক্ত করতে স্নুরু করবে।

—এই! এই!

নিরঞ্জন পাশ ফিরবে। ঘুম ঘুম চোখে বলবে—কিছু বলবে?

—শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ছ?

—ঘুম পাচ্ছে খুব। কি বলবে বল।

—ঠাকুরপোর জন্যে একটা মেয়ে ছাখ।

—কেন?—ঘুম ঘুম চোখেই বলবে নিরঞ্জন।

—কেন আবার বিয়ে করবে। ঠাকুরপোর বিয়ে করবার খুব সখ হয়েছে যে।

—তাই নাকি?

—তবে আর বলছি কি। ওর আবার যেমন তেমন মেয়ে

পছন্দ হবে না। শুনছ, এই—আরে দুর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা শোনা যায়!

—উঁ?

—ওর আবার আমার মত মেয়ে চাই।

—তোমার মত?

—হ্যাঁ। আমার মত সুন্দরী। একদম আমার মত।

নিরঞ্জনের ঘুমটা ভেঙে যায় একেবারে। বেগম কথাটা ওকে বলে বেশ আনন্দ পায়। একটুও কি জ্বলবে না এ কথায়?

—আমার জন্যেই ত' ছুটি বাড়িয়ে নিলে!—খিলখিল করে হাসে বেগম। বলে আবার—আচ্ছা আমার ভেতরে এমন কি আছে শুনি যে সবাই একেবারে···।

নিরঞ্জন চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর আস্তে আস্তে বলে—তা বেশ ভালত? মেয়ে গ্যাখ।

বেগম একটু মিইয়ে যায়।

—তুমিও গ্যাখ।—বলে বেগম।

—বেশ দেখব। তার আগে ও কিরকম মেয়ে চায় তার একটা লিষ্টি করে নাও। শুধু বাইরের রূপ চায়। না উঁচু মন চায়, না নীচু মন চায়। কি চায় লিখে রেখো।

হাসে নিরঞ্জন। খুব অল্প হাসে। এই হাসিটা বেগম সহ্য করতে পারে না।

হঠাৎ রেগে বলে—তা আমি কি করে জানব। তোমার ভাইকে তুমি জিজ্ঞেস করো। তাছাড়া—।

—তাছাড়া কি?

—সে আবার নাকি তোমায় খুব ভয় করে।

—তবে ত' বড়ই অন্যায়। তুমি কাকে ভয় কর?

বেগমের গলায় ঝাঁজ—আমি কাউকে ভয় করি না।

নিরঞ্জন একটু সময় চুপ করে থেকে বলে—এক আধজনকে

একটু ভয় করা দরকার। শুধু মানুষকেই যে ভয় করতে হবে এমন কোন মানে নেই। নিজের বিবেককে অন্ততঃ ভয় করতে হয়। তার কথা শুনতে হয়। ভয় মানেই শাসন। চুরি করলে জেল হয়। জেলের ভয়েও অন্তত তুমি চুরি করবে না। জেলের ভয় তোমাকে শাসন করবে।

—আমি জেলের ভয়ও করি না। আমার বাবাও করেন না। টাকা দিয়ে জেল আটকান যায়।

নিরঞ্জন হাসে—কিন্তু বিবেক আটকান যায় না।

—বিবেক ফিবেক সব বাজে।—বেগম গা দিয়ে ওকে একটা ধাক্কা মেরে পাশ ফিরে শোয়।

নিরঞ্জন অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে চিন্তা করে। অনেক ভাবে।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—আমার কথাগুলো ভেবে দেখ। তোমাকে বলতে আমার হবেই। যেটুকু নিতে পারবে নেবে। যেটুকু নিতে পারবে না নেবে না।

—থাম এখন। ঘুম পাচ্ছে।—একটা ধমক দেয় বেগম।

নিরঞ্জন থামে। ভাবে।

আস্তে আস্তে ওপাশ ফিরে শোয়। ঘুমোবার চেষ্টা করে।

—এই! শুনছ!

গায়ে নরম স্পর্শে আবার নিরঞ্জনের ঘুমটা ভাঙে। মনে মনে খুব বিরক্ত হলেও মুখে প্রকাশ করে না। খুব নরম স্বরে বলে—কি?

—আচ্ছা। বিবেক কাকে বলে?

নিরঞ্জন এ পাশ ফেরে।

—কি করে তোমায় বোঝাব। বিবেক বলে…মানে, তুমি একটা খারাপ কাজ করতে গেলে তোমার ভেতর থেকে যে না-না করে ওঠে।

—আমার ত' করে না।

নিরঞ্জন হাসে—তার কারণ আছে। তোমার ভেতরেও বিবেক রয়েছে। তবে মাটিচাপা আছে। মাটিটা একটু ধুয়ে গেলেই—।

—কি করে ধুয়ে যাবে ? বেগমের প্রশ্নগুলো খুব ছেলেমানুষের মত। নিরঞ্জনের এবার খুব ভাল লাগে।

—ভাল কাজ করতে করতে, অহঙ্কার কমাতে কমাতে ধুয়ে যায়।

—অহঙ্কার ত' আমার নেই !

এইবারে হাসির কথা বলেছে বেগম। নিরঞ্জন হেসে ফেলে, বল কি ? তুমি ঠিক বুঝতে পার না। বুঝতে পারলে ওটাকে তাড়াবার চেষ্টা করতে।

—কই কি অহঙ্কার আছে বল ?

নিরঞ্জন ও কথার উত্তর দিতে চায় না।

একটু এড়িয়ে বলে—না। তেমন আর কি ! তুমি কিন্তু বড় ভাল মেয়ে। তা নইলে কি আর আমি বিয়ে করতুম তোমাকে। আমি সোনা চিনি।

বেগম নিরঞ্জনের কাছ থেকে নতুন ধরনের প্রশংসা শোনে। এ রকম প্রশংসা কেউ করে নি ওকে। সবাই ওর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এমন রূপসী আর হয় না !—বলে সবাই।

এমন মেয়ে আর হয় না ! বলে না কেউ। নিরঞ্জনের কথার ভেতর ওর রূপের দিকে একটুও ইঙ্গিত থাকে না। সে কুরূপা হলেও যেন নিরঞ্জন বলত।—এমন মেয়ে আর হয় না। বেগম এতে খুব যে খুসী হয় তা নয়। তবু রাগও করে না।

চুপ করে থাকে।

—তোমার বাবার জন্যে মন কেমন করে না ?

—খুব বেশী নয়। তবে গাঁয়ের জন্যে মনটা খারাপ লাগে।

—তোমার ত' একটু বেড়ান অভ্যেস।

—হ্যাঁ। কাল ত' বেড়িয়েছিলাম। তুমি জান না।

—কোথায় ?

—রেল লাইনের ধারে সন্ধ্যে নাগাদ।

—একা একা ?

—একা গেলেও কিছু আসে যেত না। সঙ্গে ঠাকুরপো ছিল।

—সঞ্জয় ছিল! সঞ্জয়ের সঙ্গে একাএকা অতদূরে যাওয়া। সঞ্জয় সঙ্গে থাকলে অবিশ্যি—।

নিরঞ্জন চিত হয়ে শোয়।

বেগম বলে—আমি তার আগের দিনও ত' গিয়েছিলাম।

—কোথায় ?

—এক মাষ্টারমশায়ের বাড়ী। ঠাকুরপোর আবার বন্ধু সে।

—কে ? সমরের বাড়ী ?

—হ্যাঁ। সমর। ও আর ওর স্ত্রী থাকে। ছেলেপুলে অনেকগুলো! মাগো!

বেগম খিলখিল করে হাসে।

নিরঞ্জন হাসে না। চুপ করে শুয়ে থাকে।

—বউটা কি বিচ্ছিরি দেখতে।

—সমরের বউটি খুবই ভাল। ওদের খুব অভাব, বড় গরীব তবু ওর মুখে হাসিটি লেগেই আছে। বউটির ত' খুব প্রশংসা শুনেছি।

—ওই ছিরির আবার প্রশংসা!

নিরঞ্জন বলে—একটা কথা বলি। বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়াটা কি ঠিক হয়েছে ? তুমি ত' এখানে নতুন। তাছাড়া ওরাও হয়ত নেমন্তন্ন ঠিকই করত। সবাই-ই তোমায় এক-একদিন নেমন্তন্ন করবে। তার আগে কারো বাড়ী যাওয়াটা কি ভাল দেখায় ?

—তাতে কি ? তাছাড়া ঠাকুরপোর বন্ধু!

—তা বটে।—নিরঞ্জন আর কথা বলে না।

সঞ্জয় যেখানে নিয়ে গেছে। সেখানে ওর মৃদুতম আপত্তি

করাটাও অন্যায়। সঞ্জয় শুনলে কি ভাববে? হাজার হোক বয়েস হয়েছে ওর। জ্ঞানবুদ্ধিও হয়েছে। নিরঞ্জন নিজেকে সংযত করে নেয়।

হাই তুলতে তুলতে বলে বেগম—ঘুম পাচ্ছে।

—ঘুমোও।

নিরঞ্জন আর কিছু বলে না। বেগমই এবার প্রথম ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোর চারটেয় ওঠা অভ্যাস নিরঞ্জনের। ও উঠতে গিয়ে দেখে বেগমের একখানা নরম ধবধবে হাত ওর গলাটা পেঁচিয়ে আছে। ও সরাতে যায় আস্তে আস্তে। সরাতে পারে না। বেগম হাতখানা শক্ত করে পেঁচিয়ে রাখে। মানেটা খুব সোজা। উঠতে দেবে না। উঠতে না দিলে ত' চলবে না। এর চেয়েও অনেক বড় আকর্ষণ টানছে নিরঞ্জনকে। ওর দৈনন্দিন জীবনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। ওকে যেতেই হবে।

আস্তে আস্তে ও হাতটা সরাতে যায়।

—উহুঁ!—বেগম শব্দ করে।

নিরঞ্জন খুব মিষ্টি করে বলে—বড় ভাল তুমি। লক্ষ্মীমেয়ে। ছাড়। আমার কাজ রয়েছে।

ঘুম-ঘুম চোখে বলে বেগম—ছাড়ব না।

—না ছাড়লে কি করে চলে বলত? আমার কত কাজ?

উত্তরে আরও ভাল করে ওকে জড়িয়ে ধরে বেগম।

নিরঞ্জন নিরুপায়। ওর পরিষ্কার কপালের ওপরে হাত বোলাতে বোলাতে আবার বলে—সাড়ে ছ'টা থেকে আমায় পড়াতে যেতে হবে। বোঝনা কেন? তোমার এত বুদ্ধি!

—সাড়ে ছ'টার অনেক দেরী। আজ পড়াতে হবে না।

—তা কখনও হয়! খুসীর চেয়ে কর্তব্য যে অনেক বড় বেগম।

বেগম চুপ করে থাকে। ছাড়ে না।

নিরঞ্জনের প্রাণ ছটফট করে। তবু একটু সময় দেয় বেগমকে।

বেগম আবার একটু ঘুমিয়ে পড়তেই নিরঞ্জন উঠে পড়ে। সাড়ে চারটে বেজে গেছে বোধহয়।

ঘর থেকে কাপড় গামছা নিয়ে বেরিয়ে যায়।

দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে যায়। বেগম ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক।

নিরঞ্জন সোজা চলে যায় গঙ্গার ধারে।

সেখানে গিয়ে স্নানটা সেরে নেয়। তারপর কয়েকটি মধুর স্তোত্র পাঠ।

ভোরে আলো তখনও পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। শরতের আগে ভোরে একটা ঠাণ্ডা মিষ্টি বাতাস বইছে। নির্জন নদীর পাড়ে যতদূর চোখ যায় শুধু বালির চড়া। গঙ্গা এখানে খুব ফাঁপালো নয়। পাণ্ডুর পবিত্র এক তন্বীর সুললিত দেহের মত বয়ে চলেছে। ওপারে তরমুজের খেতের পেছনে একটি মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাকি এখানে একবার এসেছিলেন। কিছুদিন ছিলেন। সেখানে মন্দির গড়ে উঠেছে। সর্বত্যাগী কৃষ্ণপ্রেমিক কয়েকটি বৈষ্ণব আছেন সেখানে। তার পেছনে আকাশ।

আকাশের তলাটা ক্রমে রক্তাভ হয়ে আসছে। স্নান সেরে প্রতীক্ষায় বসে আছে নিরঞ্জন। আসন করে বসে আছে বালির ওপর। চোখদুটি ওর আকাশে। ও আরেক স্নানের প্রতীক্ষায় বসে আছে। আলোতে স্নান করে নেবে নিরঞ্জন। যে আলোয় পৃথিবী জাগবে। সেই আলোয় ও সর্বাঙ্গের তমসা ধুয়ে আজকের দিনরাতের মত নিজেকে সুস্নাত করে নেবে।

ধীরে ধীরে চৈতন্য জাগ্রত হচ্ছে যেন। বর্ণের বন্যা এলো আকাশের সীমানায়। ধুয়ে যাচ্ছে সব কালো—সব কালীমা। কি প্রশান্ত বর্ণাভা।

নিরঞ্জন তাকিয়ে আছে। সবিতুর্বরেণ্যং! ওই ত ইথারের স্রোতে রাশি রাশি আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন। আলোয় ভরে যাচ্ছে আকাশ। ধুয়ে যাচ্ছে নিরঞ্জন। চোখের জলে ধুয়ে যাচ্ছে। আনন্দে আর ধ্যানে বিমগ্ন হয়ে গেছে নিরঞ্জন।

অনেক পরে নিরঞ্জন উঠল। আজ দিনরাতের জন্যে ও নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছে। এইবার বাড়ী ফিরতে হবে। ভোরের এই স্নানশুদ্ধিটুকু না হলে ওর যেন কিছুই হ'ল না মনে হয়। এ কথা কেউ জানে না। কেউ কখনও জানবে না।

ও একা। একেবারে একা নির্জন বালুতীরে বসে প্রতিভোরে নিজেকে শুদ্ধ করে নেয়। এ শুদ্ধিটুকুই ওর একমাত্র গোপন সম্পদ। একান্ত গোপন। একান্ত আপনার।

এ আনন্দে যদি বেগম বাধা দেয়। সে বাধাও মানতে পারে না। জীবন গেলেও মানতে পারে না। এটুকু ওর একেবারে একান্ত।

ও যখন বাড়ী ফেরে তখনও ওঠেনি বেগম। প্রায় কোনদিনই ওঠে না। সঞ্জয়ও ওঠেনি।

ঘরে ঢুকে ও বেগমের দিকে তাকায়।

বেগমের শুভ্র সুপুষ্ট যৌবনভরা দেহটা পড়ে রয়েছে। গভীর তমোআচ্ছন্ন একটা দেহমাত্র। নিরঞ্জনের মনে একটুও বিকার আনতে পারে না বেগমের রক্তমাংসের শরীরটা।

একটু হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে বেগম। কোঁকড়া কোঁকড়া পিঙ্গল চুলের গোছা ছড়িয়ে আছে বিছানায়। সাড়ীটা অগোছালো ছড়ান।

ওঠো।—নিরঞ্জন ডাকে।

কেন যেন এ অবস্থায় বেগমকে ছুঁতেও ইচ্ছে করে না নিরঞ্জনের।

ছুঁতে গেলে যেন নিরঞ্জনকে অনেকটা নেমে আসতে হয়।

ও একটু তফাতে থেকে বেশ জোরে ডাকে—কই ওঠো।

বেগমের ঘুমটা ভেঙ্গে যায় হঠাৎ। উঠেই সাড়ীটা গোছাতে গিয়ে নিরঞ্জনের দিকে তাকায়। সাড়ী বুকের ওপর তুলে দু'হাতে চোখটা মুছে নেয়।

—কখন চলে গেলে তুমি ?

নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বেগমের চোখদুটো যেন জুড়িয়ে যায়। সদ্যস্নাত নিরঞ্জনের চোখে মুখে কেমন এক স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা আভা। চোখদুটি ভিজে ভিজে কালো। কত গভীর দৃষ্টি।

মনটা আপনা আপনি প্রসন্ন হয়ে ওঠে বেগমের।

—কি মানুষ! কখন উঠে গিয়ে স্নান করে এসেছে! আমাকে ডাকতে পারোনি ?

—ডাকলে কি উঠতে ?

—উঠতুম। উঠে তোমার সঙ্গে স্নান করতে যেতুম।

—সত্যি যেতে ?

—সত্যি যেতুম। একদিন ডেকে দেখ। রোজই ত' যাও, একদিনও ত' ডাক না!

নিরঞ্জন চুপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বেগম উঠে বেরিয়ে যায়। চা জলখাবারের ব্যবস্থা হ'ল কিনা দেখতে হবে। রাঁধুনিটাকে না খোচালে কিছুতেই তাড়াতাড়ি করবে না। হয়ত না খেয়েই বেরিয়ে যাবে নিরঞ্জন ছাত্র পড়াতে।

এমন ত কতদিন গেছে।

—চা খেয়ে যাও।—বেগম বলেছে।

নিরঞ্জন একটুও অভিযোগ করেনি। হাসিমুখে বলেছে—থাক, আর সময় নেই। তোমরা খাও। আমি যদি পারি ঘুরে এসে খাব।

তারপর আর খাওয়া হয়নি। এসে ভাত খেয়ে বেরিয়ে গেছে স্কুলে। ফিরেছে সেই সন্ধ্যের আগে।

বেগম অবাক হয়েছে। এতটুকু অভিযোগ নেই। এতটুকু বিরক্তি নেই। কি শান্ত মানুষ!

সদানন্দও শান্ত। কিন্তু ভীতু বোকা। লোভে পড়তে ভয় করে কিন্তু ভয় কেটে গেলে ওর লোভ বড় বেশী চোখে পড়ে। ভালবাসতে ভয় পায়। কিন্তু ভালবাসলে মরে গিয়ে ভালবাসে। নিজের বলে আর কিছুই রাখে না।

. খরগোসের মত ভীতু চোখদুটোর কথা মনে পড়লেই হাসি পায় বেগমের।

আর নিরঞ্জন। এও শান্ত, কিন্তু এর তল পাওয়া ভার।

আজ পর্যন্তও বেগম মানুষটাকে ভাল করে বুঝে উঠতে পাচ্ছে না। ওর নাগাল পাচ্ছে না যেন। লোভ দেখিয়ে নাগাল পাওয়া যাবে না। এ কথাটা বেগম পরিষ্কার বুঝেছে।

নিরঞ্জনের চোখে লোভীর লোলুপতা আজ পর্যন্ত দেখতে পেল না বেগম। কিন্তু এটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে নিরঞ্জন ওকে ভালবাসছে।

এ ভালবাসার স্বাদ বেগমের কাছে মাঝে মাঝে বিস্বাদ লাগে। মাঝে মাঝে অমৃত মনে হয়। বেগম অবাক হয়। প্রাণপণে অস্বীকার করবার চেষ্টা করলেও একটু যেন ভয় ভয় করে নিরঞ্জনকে। নিরঞ্জনের কথা ভাবে। কুলকিনারা পায় না।

নিরঞ্জনের জন্যে মাঝে মাঝে ব্যস্তও হয়ে পড়ে।

যে লোকটা কিছু চায় না, তার জন্যেই বেশী ব্যস্ততা আসে।

কেন যে এমন হয়!

মনে মনে অবাক হয়ে যায় বেগম। কখনও ওর এমন স্বভাব ত' ছিল না!

না খেয়ে একটা মানুষ চলে গেল। গেলই বা! ও কখনো এ সব গ্রাহ্য করত না। মাথাও ঘামাত না।

না খেয়ে গেলে খানিকটা রাগ করবে। এসে খানিকটা চীৎকার

করবে। এই রকমই ত' দেখে এসেছে ও। কিন্তু এ কি রকম মানুষ।

সেদিন রান্না হয়ে ওঠে নি। বেগম শুনল নিরঞ্জনের খাওয়া হ'ল না।

শুনে ভাল লাগল না ওর। না খেয়ে সমস্ত দিন খাটবে মানুষটা! সে একবার রান্নাঘরে গেলে পারত। চা খেতে খেতে সঞ্জয়ের সঙ্গে গল্প না করলেই হ'ত।

ঝি এসে খবরটা দিতেই বেগম সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে বলে—আসছি ঠাকুর পো!

বলে নিজের ঘরে যায়। গিয়ে দেখে নিরঞ্জন জামা পরছে। বেগম এমন সময় বড় একটা ঘরে আসে না। নিরঞ্জন তাকায় তাই।

বেগমের ইচ্ছে হয় বলে—খেলে না কেন? কিন্তু বলতে বাধো বাধো লাগে। কখনো ত' এ ধরণের কথা বলতে ও অভ্যস্ত নয়। নিজেকে যেন কেমন খাটো মনে হয়।

কারো কাছ থেকে শুনে ও নিরঞ্জনের খাবার খবর নিতে এসেছে এটা ভাবতে ওর কেমন যেন লাগে।

—শোন এসেছ ভালই হয়েছে। এই টাকা দুটো দাও ঝিকে। বলো ভাল চিতল মাছের পেটি উঠেছে বাজারে। ও যেন নিয়ে আসে। সঞ্জয় খেতে ভালবাসে।

দুটো টাকা বার করে একটু হেসে বলে—আমার ছাত্রের বাড়ী এসেছে কিনা, দেখে মনে হ'ল সঞ্জয় খেতে খুব ভালবাসে, তাই।

বেগম অবাক হয়ে তাকায়। মুখটা ওর রাঙা হয়ে ওঠে—না এ বেলা মাছের পেটি রান্না হবে না।

—কেন?—নিরঞ্জনও অবাক হয়ে তাকায়।

বেগমের গলা কাঁপে—একজন না খেয়ে চলে যাবে। আর সবাই মাছের পেটি খাবে। তা হয় না।

বেগম রক্তাভ মুখটা অন্য দিকে ফেরায়।

নিরঞ্জন এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হেসে ফেলে—ও এই কথা! এ আমার অভ্যেস আছে। বিয়ের আগে ত' হামেশাই এমন হ'ত।

—এমন হওয়াটা ভাল নয়?

বেগম এ সব কি বলছে—ও নিজেই বুঝে উঠতে পারে না।

নিরঞ্জন বলে—তা হোক। আমার খাওয়া না খাওয়ায় কি আসে যায়! ঝিকে বাজারে পাঠাও। না হয় আমার জন্যে মাছ একখানা রেখে দিতে বল। ওবেলা খাওয়া যাবে।

—আর এ বেলা?

—এ বেলা ইস্কুলে চা বিস্কুট-টিস্কুট খেয়েই চলে যাবে।

টাকা দুটো বেগমের হাতে দিয়ে বেরিয়ে যায় নিরঞ্জন।

বেগমের পরিবর্তন হচ্ছে হয়ত। নিরঞ্জনের বেশ ভাল লাগে ভাবতে। বেগমের ভেতরে যে তেজ যে শক্তি ও দেখেছে, তাকে পরিশুদ্ধ করে নিতে পারলে অনেক বড় কাজে লাগবে বেগম। নিরঞ্জন বেশ ভাল করেই জানে যে ওর মত তেজ আর নির্ভীকতা সংসারে খুব কম মেয়ের আছে। এই পুঞ্জীভুত তেজ কাজে লাগাতে হবে।

নিরঞ্জন এক পরীক্ষার নেশায় মেতেছে।

বেগম ঘর থেকে বেরোয়। মাছ আনায়।

নিজে রান্নাঘরে বসে রান্না করায়।

সঞ্জয় এক বার ডাকে—বৌদি আসুন না। একটু লুডো খেলা যাক।

বেগম হেসে তাকায়—একটু পরে ভাই ঠাকুরপো। তোমার মাছটা ভাল করে রাঁধাই।

সঞ্জয় আর কিছু বলে না।

বেগম মাছ রান্না হলে দুটো এনামেলের বাটিতে ভাত মাছ

সাজিয়ে একখানা থালা দিয়ে ঢেকে ঝিকে বলে—বাবুর ইস্কুল চিনিস ?

—চিনব না কেন ? ওই ত' হোথা।

—তবে চট্ করে এই ভাত মাছটা দিয়ে আয়। বলবি টিফিনে খেয়ে নিতে।

ঝি একটু অবাক হয়। যত সব আদিখ্যেতা! বিরক্ত হয় কিন্তু তাকে নিয়ে যেতে হয়।

এইবার বেগম আর সঞ্জয় খেতে বসে।

সঞ্জয়ের আবার বৌদির সঙ্গে বসে না খেলে ঠিক জমে না। ওরা গল্প করতে করতে খায়। বেগম খায় বটে, কিন্তু মনটা পড়ে থাকে ইস্কুলের দিকে।

খাওয়া যখন ওদের প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন ঝিটা ফেরে ইস্কুল থেকে।

—কিরে কি হ'ল ? বেগম জিজ্ঞেস করে—খেয়েছে ?

ঝি বলে—নাগো। তেনা ত খেলে নি। বললে, আমি কি কোন জন্মে ইস্কুলে খাই ? নিয়ে যা বিকেলে খাব।

সঞ্জয় জিজ্ঞেস করে --কি বৌদি !

বেগমের মুখখানা টকটকে লাল হয়ে ওঠে। মেজাজটা মুহূর্তে টং হয়ে যায়। ছি। ছি। কেন সে পাঠাতে গিয়েছিল। সেধে গালে চড় খাওয়া।

বেশ চড়া স্বরে বলে—তখনই ঝিটাকে বললুম। নিতে হবে না ভাত। ঝিয়ের আবার বেশী দরদ। না খেল ত' না খেল।

রাঁধুনির দিকে তাকিয়ে বলে—দে মাছখানা আমাদের দিয়ে দে। ওবেলার জন্যে আর রাখতে হবে না। ও বেলা যা হবে তাই খাবে।

মাছখানা নিয়ে খেয়ে ফেলে বেগম। মেজাজটা একেবারে পালটে যায় ওর। শরীরে রক্তটা বড্ড বেশী গরম হয়ে যায়। কানদুটো গরম লাগে।

—ঠাকুর পো, আজ আমার ঘরে শোবে দুপুরে? বেশ গল্প করা যাবে।

সঞ্জয় তাকায়। বেগমের মুখে সেই মারাত্মক হাসি। চোখে সেই দৃষ্টি।

সঞ্জয় একটু ভাবে। একটু ইতস্ততঃ করে।

তারপর বলে—আচ্ছা একটা মাদুর পেতে রেখো।

বেগম উঠে পড়ে। আঁচিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়।

ঘরে এসে পানের বাটা নিয়ে বসে। একটু পরেই সঞ্জয় একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরে আসে।

বেগম পা-দুটো ছড়িয়ে বসেছে। সঞ্জয় আসতে কি একটা মনে করে হেসে ফেলে।

—পান খাবে?

—রোজই ত' খাই।

—না, এমনি বলছি। তোমার দাদা আবার কাল একটু বকেছে কিনা?

—কেন? সঞ্জয়ের মুখটা শুকিয়ে যায়।

বেগম মৃদু মৃদু হাসে আর তাকায়। ওর বাদামী চোখের মণি দুটো ঝকমকিয়ে উঠেছে আবার।

সঞ্জয় বলে—আজ বরং ঘরে বসে গল্প করা যাবে।

—তা কর কিন্তু···।

—কিন্তু আর কি? তোমার দাদার মনটা বড় ছোট।

—সে কি—সঞ্জয়ের মুখটা সাদা হয়ে যায়—না, না। একি বলছেন। দাদার মত মানুষ সংসারে অতি অল্প হয়।

বেগম নীচের ঠোঁটটা ফুলিয়ে বলে—তাত' বলবেই তোমরা। আমার কথা শুনতে হয়। এই ত' সেদিন রাত্তিরে তোমার সঙ্গে বেড়াই বেরোই বলে সব যা তা বললেন।

সঞ্জয়ের চোখদুটো স্তিমিত হয়ে আসে।

—হতে পারে না। এ কি বলছেন আপনি ?

—যা হয়েছে, তাই বলছি।—নাও পান খাও।

পান ছুটো ওর হাতে দেয় বেগম।

—সত্যি বলছেন ?

—সত্যি না ত' কি মিথ্যে বলছি ? থাকগে পান খাও।

পান ছুটো মুখে দিয়ে সিগারেটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় সঞ্জয়।

—আজ কোথায় বেড়াতে যাবে বল ?

সঞ্জয় কথা বলে না।

একটা ঠেলা মারে বেগম—কি হ'ল ? বল। আজ বরং নদীর ধারে যাওয়া যাবে। কি বল ?

ও তাকায় বেগমের দিকে।

বেগম হেসে বলে—ও সব কিছু ভেবো না। তোমার দাদাকে আমি গ্রাহ্যিই করি ভারি। কি বলব তোমাকে, ওর কোন ফুর্তি আনন্দ বলে জিনিষ নেই।

—সেটা বোধ হয় ঠিক ! আপনি ঠিকই বলছেন বৌদি।—সঞ্জয় আর একটা সিগারেট ধরায়। ভ্রূছুটো কুঁচকে যায় ওর।

—তুমি না থাকলে যে আমার কি দশা হ'ত। তবু তোমার সঙ্গে ছুটো হাসি তামাসা করে সময় কাটে। আমি আবার একটু আমুদে মানুষ কিনা ?

সঞ্জয় ঘাড় নাড়ে—ঠিকই বলেছেন। দাদা রাত্তিরটুকু ছাড়া বাড়ীই থাকে না। আপনার ওপর একটুও যেন ইয়ে নেই।

—অমন কাঠখোট্টা লোকের আবার ইয়ে কি থাকবে শুনি ? তুমি চাকরী ছেড়ে এখানে যদি থাকতে, তবে বেশ মজা হ'ত !

সঞ্জয় চুপ করে বসে সিগারেট টানে।

পানের বাটা তুলে রাখতে রাখতে বেগম ওকে বলে—একটা মাছুর পেতে দিই। শুয়ে পড়।

একটা মাছুর আর একটা বালিশ পেতে দেয়।

বেগম গিয়ে খাটের ওপর গড়িয়ে পড়ে।

সঞ্জয়ের দিকে চোখ বেঁকিয়ে তাকায় বেগম—তার চেয়ে বরং চল, তোমার চাকরীর জায়গায় চলে যাই। বেড়িয়ে আসি।

—যাবেন সত্যি ?

—গেলে রাখবে কোথায় ?

—কেন কোয়ার্টার আছে। কোন অসুবিধে হবে না। আমি ত' দিনে দু'তিনবার কোয়ার্টারে আসি। যাবেন সত্যি ? বলব দাদাকে ?

—চোখদুটো আধ বোঁজা করে বলে বেগম—আচ্ছা, ভেবে দেখি। আমার ঘুম পাচ্ছে। বলে চোখদুটো বোজে বেগম।

সঞ্জয় চুপ করে বসে থাকে। আর একটা সিগারেট ধরায়। দাদার ওপর একটা অদম্য ঘৃণা ওর গলা পর্যন্ত ঠেলে ওঠে। তাকে এতখানি ছোট ভাবতে পারল কি করে ? সত্যিই কি বৌদিকে নিয়ে বেড়াতে যাবার জন্যে অসন্তুষ্ট হয়েছে দাদা ? এতে ত' কোন অন্যায় সে দেখছে না। বৌদিকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া এতে অন্যায়টা কি থাকতে পারে।

সুন্দরী বউ পেয়েই কি দাদা তবে এতটা নীচে নেমে গেছে !

বৌদির ত' কোন দোষ নেই। বৌদি ত' সত্যিই তাকে ভালবাসে। দেওরের মত ভালবাসে। কিন্তু বৌদির চোখের ভাষাটা অবোধ্য। ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় কি যেন একটা বলতে চায়, বলতে পারে না। আজ ত' পরিষ্কারই বলল, দাদাকে নিয়ে সে সুখী নয়। আর সুখী হবেই বা কি করে ? মাষ্টারি করে করে দাদার মনের কোমলতা সব শুকিয়ে গেছে।

বৌদির জন্যে বড় কষ্ট হয়।

খাটের দিকে তাকায় সঞ্জয়। বৌদি ঘুমোচ্ছে। একি ! সঞ্জয়ের কর্ণমূল পর্যন্ত রাঙ্গা হয়ে ওঠে।

বৌদির বুকের ওপর আঁচল নেই। ছড়িয়ে গেছে বিছানার ওপর।

জানালার এক পাশ থেকে গালের ওপর রোদের আভা পড়েছে। টানাটানা চোখদুটি বোঁজা। একবার পাশ ফিরল বেগম। সাড়ীটা আরও এলিয়ে গেল।

হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত দেখা যায়। সুপুষ্ট, ধবধবে।

সঞ্জয়ের কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছে।

আরেকটা সিগারেট ধরায় ও। ওর এখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বেরোবে কি, ওর সর্বশরীর কাঠ হয়ে গেছে। বুকের শব্দ নিজের কানে শুনতে পাচ্ছে।

জোর করে উঠে পড়ে সঞ্জয়। উঠে দোরের কাছে যেতে গিয়ে যে কিসের এক অদৃশ্য টানে খাটের কাছে এগিয়ে আসে।

দাঁড়িয়ে পড়ে সেখানে। পা দুটো আঠার মত আটকে গেছে মাটিতে।

চোখদুটো ওর রক্তাভ হয়েছে। শরীর দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। দু'পা এগিয়ে যায় সঞ্জয়।

বেগমের ফোলা ঠোঁটদুটির ওপর পর্যন্ত রোদ এসে পড়েছে। বেগমের বুকের ওঠানামা গোনা যায়।

তাকিয়ে আছে সঞ্জয়। চোখ ফেরাবার চেষ্টা করেও পাচ্ছে না।

কোথায় নামছে ও নিজেই জানে না। অসহায়ের মত ভেসে চলেছে।

বেগমের মুখের কাছে এসে দাঁড়ায়। দুম দুম করে হাতুড়ী পিটছে যেন বুকে। আর পারছে না। ও আপ্রাণ চেষ্টা করেও নিজেকে আর রোধ করতে পারছে না।

বেগমের কাঁধদুটো চেপে ধরে দু'হাতে। সমস্ত দেহটা নিয়ে নীচু হতেই বেগম চট করে তাকায়।

এতক্ষন যেন ইচ্ছে করেই চোখ বুঁজে ছিল বেগম।

ফিক করে হেসে বলে—ঠাকুরপো!

সঞ্জয়ের মুখের ওপর যেন এক ঝলক আগুন এসে পড়ে।

মুহূর্তে ঘুরে ও প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

উঠে বসে বেগম। আপন মনে হাসতে হাসতে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে আবার। চাবুক খাওয়া কুকুরের মত পালিয়ে গেল সঞ্জয়। বহুদিন পরে আনন্দে নিজের মনে খিল খিল করে হেসে ওঠে ও। গমকে গমকে হাসে।

হাসির বেগ কমলে ভাবে, গেল কোথায় ?

পেছন পেছন তাড়া করলে মন্দ হ'ত না।

আবার হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে বেগম। বুকের ভেতরে একটা তৃপ্তি অনুভব করে। থাক এখন আর ও যাবে না। বিকেলে গিয়ে সঞ্জয়কে দেখে হাসবে আর ঠাট্টা করবে। কথাগুলো সময়মত বলবে নিরঞ্জনকে। এক একটা কথা এক এক ঘা চাবুকের মত পড়বে নিরঞ্জনের গায়ে। জ্বলবে নিরঞ্জন। ভাইয়ের অপমানে জ্বলবে। ভাইয়ের পতনে জ্বলবে।

বেগম শুধু হাসবে। অজস্র হাসবে।

ভাবতে ভাবতে বেগম আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এবারে পরিতৃপ্ত মন নিয়ে ঘুমোয়।

আজ একটু সকাল সকাল ফেরে নিরঞ্জন। খাবার পাঠিয়েছিল বেগম। ও ফেরত দিয়েছে। ফেরত দেবার পর থেকেই ওর মনে হয়েছে, কাজটা ঠিক হ'ল না। বেগমকে যতখানি চিনেছে তাতে বেগম খাবার ফেরত দেওয়াটা অন্য ভাবেও নিতে পারে। ছোটবেলা থেকেই ঠিক ঠিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভাবে বেগমের ভেতরে অভিমান সব সময় ফনা ধরেই আছে। বেশ বুঝতে পারে নিরঞ্জন। ওর অভিমান যখন সুতীব্র হয়, তখন সেটা চোখের জলে না ধুয়ে অন্যভাবে প্রকাশ পায়। এইটেই ওর জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক মনোভাব।

বেগম যা চায়, সেটা তাকে পেতেই হবে। না পেলে অভিমান

হয়। অভিমান থেকে নিদারুণ ক্রোধ। 'ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ, সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রম।' গীতার শ্লোক মনে পড়ে নিরঞ্জনের। স্মৃতিভ্রম হলে বুদ্ধিনাশ। কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আর বুদ্ধিনাশ থেকে সর্বনাশ।

একে রোধ করতেই হবে। বেগমকে অন্যদিকে ঘোরাতে হবে। নিরঞ্জন মনে মনে ভাবে আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।

খাবারটা ফেরত দিয়ে আজ ভাল করেনি।

নিরঞ্জন হয়ত বা সেইজন্যেই তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরে।

ঘরে ঢুকে দেখে বেগম ঘুমোচ্ছে। এত অবেলায় ত' অন্যদিন ঘুমোয় না। গা ধুয়ে চুল বেঁধে নিজের প্রসাধনে ব্যস্ত থাকে।

আস্তে একটু ঠেলে নিরঞ্জন।

আবার ধাক্কা দেয়।

—কে ঠাকুরপো!—বলে চোখ মেলে নিরঞ্জনকে দেখে একটু অপ্রস্তুতে পড়ে বেগম। ও ঘুমের ভেতর দেখছিল সঞ্জয় এসেছে। এসে ওকে ডাকছে। সঞ্জয় কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে ডাকছে।

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—অ! তুমি?

নিরঞ্জন কথা না বলে গম্ভীর মুখে জামা ছেড়ে গামছা হাতে নিয়ে ঝিকে ডাকে জল তুলে দিতে।

ঝি ভেতরে এসে নিরঞ্জনের হাতে একটি সাদা খাম দেয়।

ভ্রূ দুটো কুঁচকে নিরঞ্জন বলে—কে দিল?

—ছোটদাদাবাবু।

—সঞ্জয়! সঞ্জয় কই? চিঠি কেন?

ঝি বলে—তেনা ত' বেছনা প্যাঁটরা নিয়ে বেইরে গেছেন অনেক্ষণ।

—বেরিয়ে গেছে!—নিরঞ্জন চিঠিটা নিয়ে মাদুরের ওপর বসে।

বেগম একটা কথাও বলতে পারে না।

কাত হয়ে বসে থাকে। বেরিয়ে গেছে ঠাকুরপো। বেগমের ঠাট্টাটুকু বুঝতে পারল না? সঞ্জয়ের ওপর সত্যিসত্যিই বেগমের একটু স্নেহ পড়েছিল ওর নিজেরই অজ্ঞাতে। মনটা যেন মুহূর্তে বিস্বাদ হয়ে যায়। বেরিয়ে গেছে সঞ্জয়! চলে গেছে!

যাবার আগে বেগমের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে পারত।

পুরুষ মানুষ এত ভীতু! সাত তাড়াতাড়ি পালাবার কি ছিল। এমন গুরুতর ত' কিছু হয়নি। এমন ঘটনা ত' বেগমের জীবনে হামেশাই হয়ে থাকে। হয়েছেও।

ও নীরবে বসে থাকে খাটের ওপর।

নিরঞ্জন মাদুরের ওপর বসে কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবে। হয়ত বা নিজের মনকে শান্ত করবার চেষ্টা করে। শান্ত মন না নিয়ে ও চিঠি খুলবে না। উত্তেজিত মনে চিঠির অর্থ ঠিকমত বোধগম্য হবে না।

—এক গেলাস জল খাওয়াবে?

বিরস মুখে বসে থাকে বেগম। উত্তরও দেয় না। নড়েও না।

—শুনছ?

—কি?

—এক গেলাস জল দাও না?

—পারব না।—বলে বেগম তেমনি বসে থাকে।

নিরঞ্জন একটুখানি হেসে নিজেই উঠে জল ভরে খায়।

তারপর আস্তে আস্তে খামটা ছেঁড়ে। হ্যাঁ, সঞ্জয় লিখেছে। সঞ্জয়ের হাতের লেখা।

শ্রীচরনেষু—দাদা, এ চিঠি যখন পাবে, তখন আমি যে কোন একটা ট্রেনে চেপে অনেকদূর চলে গেছি। তোমাকে না বলে চলে গেলাম বলে ক্ষমা কর।

নিরঞ্জন চোখ তোলে চিঠি থেকে। সঞ্জয় তাহলে সত্যিই চলে

গেছে। কিন্তু কেন হঠাৎ এমন চলে গেল। বেগমের দিকে একবার তাকায়।

বেগম মুখখানা অন্ধকার করে বসে আছে। বেগম ভাবতেও পারেনি যে সঞ্জয় এমন হঠাৎ একেবারে চলে যেতে পারে। চিঠিতে কি লিখেছে জিজ্ঞেস করে না। কি লিখবে ও ত' জানে।

নিরঞ্জন পড়তে থাকে —

তোমাকে একটা কথা খুলে বলা দরকার দাদা। কিছুদিনের জন্যে আমি পতঙ্গ হয়েছিলাম। আজ আগুন দেখে ঝাঁপাতে গিয়ে পুড়ে ঝলসে পালিয়ে যাচ্ছি।

তোমার মত মানুষের ভাই হয়ে কেন পতঙ্গের মত ক্ষুদ্র হলাম। সে কথা ভেবে লিখতে লিখতে আমি নিজেই অবাক হচ্ছি।

কিছুদিন ধরে আমি বৌদির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ঠিক আকৃষ্ট হয়েছিলাম না উনিই আকর্ষণ করেছিলেন এখনও ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। বুঝতে একটু সময় নেবে।

বৌদির আকর্ষনীশক্তি অসাধারণ শুধু নয়, অমোঘ। নিয়তির মত নিষ্ঠুর ভাবে যে কোন মানুষকে নিজের কাছে টেনে নেবার ক্ষমতা আছে। এ এক আশ্চর্য ক্ষমতা।

আমি নিজে অনুভব করে অবাক হয়ে গেছি।

বৌদি রূপসী, মোহময়ী। যে কোন লোককে মোহের অন্ধকারে টেনে নামাতে পারেন। টেনে নামাবার ক্ষমতা যাঁর থাকে, টেনে তোলবার ক্ষমতাও তারই থাকে।

আমি বার বার ঈশ্বরের কাছ প্রার্থনা করি বৌদির এই আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি যেন মানুষকে মোহময় অন্ধকার থেকে টেনে তোলবার কাজে লাগান।

শক্তি যার আছে, সে শক্তিকে ভাল দিকে প্রয়োগ করতে পারে, ইচ্ছে হলে খারাপ দিকে প্রয়োগ করতে পারে। তিনি তাঁর শক্তিকে উঁচু দিকে প্রয়োগ করুন।

এ সব কথা তোমাকে আর বুঝিয়ে কি বলব। তুমি আমার চেয়েও জ্ঞানী।

তোমার নামেও কতকগুলো নীচ কথা বলে বৌদি আমার মনকে তোমার ওপর বিরূপ করে তুলেছিলেন। হয়ত বা কোন সর্বনাশই হ'ত।

কিন্তু এখন আমি সব বুঝতে পাচ্ছি।

আমি বুঝতে পাচ্ছি, সে সব কথা কত মিথ্যে। কত জঘন্য!

বৌদির এত কাছাকাছি থেকে তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে পারবে কি না জানিনে। তোমার জন্য আজ আমার বড় ভয় হচ্ছে।

বিপদে পড়লে আমায় ডেকো।

ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন।

বৌদিকে আমার প্রণাম জানিও। তুমি প্রণাম নিও।

আমি দু' একদিনের মধ্যেই জলপাইগুড়ি পৌঁছব। ইতি, সঞ্জয়।

চিঠিখানা পড়া শেষ করে নিরঞ্জন চুপ করে বসে রইল। ও যা আশা করেছিল সেটা যে এমন নিষ্ঠুর সত্যের মত ওর সামনে এসে দাঁড়াবে, একথা নিরঞ্জন সত্যিই ভাবতে পারেনি। দিনের আলোর মত সবকিছু ওর সামনে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। সব বুঝতে পাচ্ছে ও। কিন্তু ঘটনাটা এত নিষ্ঠুর এত করুণ যে কিছু বলবার উপায় নেই। এখন কিছু বলতে গেলে অনর্থটা সর্বনাশে দাঁড়াবে। নিরঞ্জন নিতান্ত অসহায়।

শুধু অসহায় নয়। ও বেগমকে দিয়ে যা চাইছে। বেগমকে যেমন ভাবে দেখতে চাইছে, তেমন ভাবে বেগমকে পেতে হলে এখন কিছু বলা যাবে না।

চুপ করে থাকতে হবে। একটা কথাও বলা যাবে না।

ওই ত' বেগম বসে আছে। ইচ্ছে করলেই ও বেগমকে গিয়ে

ধরতে পারে। জবাব চাইতে পারে। জোর করতে পারে। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না।

সংসারে গায়ের জোরে সব কিছুর মীমাংসা হয় না।

চুপ করে বসে থাকে নিরঞ্জন।

বেগমও চুপ করে বসে আছে। ভেতরে ফণা তুলে বসে আছে।

নিরঞ্জন একটা কিছু বললে হয়। তুমুল কাণ্ড করবে বেগম।

দরকার হলে ওর মাথাটা ত্ন'খানা করে দিয়ে বাবার কাছে চলে যাবে।

নিজের অন্যায়কে নিজের মনে ন্যায় বলে মেনে নিতে চেষ্টা করছে। তাতে করে রাগ হচ্ছে ওর প্রচণ্ড। সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ছে নিরঞ্জনের ওপর।

ও নিরঞ্জনের কাছ থেকে একটা কড়া কথার অপেক্ষা করছে শুধু।

কিন্তু একি নিরঞ্জন মৃত্ন মৃত্ন হাসছে।

বেগমের দিকে শান্ত চোখে তাকাচ্ছে।

—দেখত' চা-টা হ'ল কিনা?

নিরঞ্জনের কথা শুনে বেগম আরও একবার নিদারুণ অবাক হয়।

লোকটাকে কিছুই ত' বোঝা যাচ্ছে না!

ও আজ পর্যন্ত এ লোকটার কাছ থেকে যা আশা করেছে। সেইটেই বিফল হয়েছে। ও আশা করেছে ক্রোধ, পেয়েছে প্রশান্তি। আশা করেছে নারী লোলুপতা, পেয়েছে নির্বিকার পবিত্রতা। আশা করেছে আসক্তির আদর, পেয়েছে নির্লিপ্ত স্নেহ।

বার বার হেরে গিয়ে রাগ ওর বেড়ে যাচ্ছে আরও। জিদ বেড়ে যাচ্ছে।

গুম্ হয়ে বসে থাকে বেগম।

ঝি চা নিয়ে আসে। জলখাবার নিয়ে আসে।

চা খেতে খেতে নিরঞ্জন হেসে বলে—ছেলেমানুষ সঞ্জয়। ওর জন্যে মন খারাপ কর না। ও আবার আসবে।

—না আসলেই বা আমার কি আসে যায়!—তীব্রস্বরে বলে বেগম।

—তবে ত' ভালই। চুপ করে বসে আছ কেন তবে?

—আমার খুসী।

নিরঞ্জন আর কথা বলে না। কথায় কথা বেড়ে যাবে।

ভাত খেয়ে জামাটা পরে আবার ওকে বেরোতে হবে। তার আগে সঞ্জয়কে একটা চিঠি লিখে আজই পোষ্ট করতে হবে।

নিরঞ্জন কলম আর কাগজ বার করে। সাদা খাম বার করে। বেয়ারিং চিঠি দেবে। আজই ছাত্রের বাড়ী যাবার মুখে পোষ্ট অফিসে ফেলে দিয়ে যাবে।

ছোট একটুকরো কাগজে লেখে নিরঞ্জন।

প্রাণাধিকেষু—তোমার চিঠিখানি পেলাম। তোমার চলে যাবার কোন দরকার ছিল না। যা বলবার আমাকে বললেই পারতে।

তোমার চিঠি পড়ে আমার এই কথাই মনে হয়েছে যে তোমার একটুও দোষ নেই। তুমি কিছু অপরাধ করনি। শুধু তাই নয়। তোমার বৌদিরও কোন দোষ নেই।

সংসার বড় কঠিন স্থান। জীবনে আর কখনও এতটুকুতে এত বিচলিত হয়ো না।

পূজোর ছুটিতে নিশ্চয়ই এসো।

কেমন থাকো জানাবে। ইতি, তোমার দাদা।

ছোট চিঠিখানা লিখে আর একবার পড়ে নিরঞ্জন।

তারপর ভাঁজ করে একটা খামে পুরে পকেটে নিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

বেগম তেমনি বসে থাকে চুপ করে।

তবুও নিরঞ্জন রাগল না। একটা কথারও প্রতিবাদ করল না। আশ্চর্য!

বেগমের আগের স্বভাবটা আবার পুরোমাত্রায় দেখা যেতে লাগল। নিরঞ্জন শুধু হাসিমুখে ওকে বোঝাতে লাগল দিনের পর দিন। জীবনকে আরও গভীর করে দেখ। আরও ভাল করে ভাব। প্রতিদিন শোবার আগে একটু চিন্তা কর সমস্ত দিনটা কি করলে, আর কি করলে না, যা করা উচিত ছিল।

অনেক রকমে গল্প বলে হেসে হেসে নিরঞ্জন বেগমকে বুঝিয়েছে।

এমন কিছু করা কখনই উচিত নয় যাতে মানুষ ব্যথা পায়। কষ্ট পায়।

বেগম শুনেছে, হেসেছে, ঠাট্টা করেছে। এক আধ সময় বোঝবার চেষ্টা করেছে। প্রশ্ন করেছে। উত্তর পেয়েছে।

একটা সুদীর্ঘ বছর কেটে গেছে। এর ভেতর সঞ্জয় আর আসেনি। নিরঞ্জন লিখেছিল। সঞ্জয় জানিয়েছে, সময় নেই। আসা হবে না।

নিরঞ্জনকে নিমন্ত্রণ করেছে প্রায় সব বাড়ী থেকে।

পোস্টমাষ্টার নিমন্ত্রণ করছে। বেগমকে নিয়ে গেছে ও।

পোস্টমাস্টার বয়েসে ছোকরা। বিয়ে করেছে। ছেলেপুলে হয়নি। একটি ভাগ্নেকে নিয়ে আছে।

ভাগ্নেটাকে দেখে বেগম হেসে অস্থির।

নিরঞ্জন চোখের ইসারায় বারণ করে।

বেগম হেসেই অস্থির।

পোষ্টমাষ্টারের বউকে বলে—ছেলেটার চেহারাটা এমন কাছিমের মত কেন ভাই?

ছেলেটার পিঠটা কুঁজো। তারওপর বেঁটে মোটা।

বেগমের কথা ছেলেটার কানে যায়। মুখটা ওর ম্লান হয়ে যায়।

নিরঞ্জন অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করে।

কথাটা ঘোরাবার জন্যে বলে—জানেন, আমার স্ত্রীর একটি বড় সুন্দর অভ্যেস আছে।

—কি?

—কি আবার অভ্যেস?—বেগমও শুনতে চায়।

হাসতে হাসতে বলে নিরঞ্জন—ঘুমোলেই ব্যাঙের ডাক শোনা যায়।

—মানে?

—মানে নাক ডাকে।

সবাই হেসে ওঠে। বেগম রাঙা হয়ে ওঠে।

রেগে গিয়ে বলে—তোমায় বলেছে। সব বাজে কথা। এত মিথ্যুক!

নিরঞ্জন হেসেই বলে—অমনি রেগে গেলে। সত্যি কি নাক ডাকে নাকি। এমনি বললুম।

পোষ্টমাষ্টার ছোকরার কথা একটু বোকা বোকা ধরণের।

বলে—এমন যার নাক। তা আবার কখনও ডাকে?

হো হো করে হেসে ওঠে নিরঞ্জন।

বেগমের নাক চোখ অতি নিখুঁত। সন্দেহ নেই। তবু পোষ্টমাষ্টারের প্রশংসাটা বড়ই বেমানান শোনায়। পোস্টমাস্টারের বউ একটু চটে।

নিরঞ্জন বলে—এখন নাকতত্ত্ব থাক। একটা কথা। আমি

বেশীক্ষণ বসতে পারব না। এখন উঠি। এসে খাওয়া দাওয়া করে ওকে নিয়ে যাব।

নিরঞ্জন চলে যায়।

বেগম পোস্টমাস্টারের ভাবটা ধরে ফেলে। বুঝতে পারে ছোকরা ওর রূপে বিমুগ্ধ হয়ে গেছে। ওর স্ত্রী পছন্দ না করলেও অনেক বেমানান কথা বলে ফেলে।

বেগম ওর স্ত্রীর সামনেই পোষ্টমাষ্টারের কাছে গিয়ে বসে গল্প সুরু করে—ক'দিন এসেছেন এখানে? আমার বিয়ের আগে?

—অনেক আগে। বছর তিনেক হ'ল।

ওর স্ত্রী এসে কাছে বসে। বেগম তার দিকে তাকায়ও না।

বলে—এর আগে কোথায় ছিলেন?

—বর্ধমান জেলাতেই ছিলুম। সে জায়গাটা খুব ভাল ছিল না। এখানে বেশ ভালই লাগছে।

ওর স্ত্রী বলে—উনি আবার এ জায়গা ছেড়ে নড়তেই চাইছেন না।

বেগম ওর স্ত্রীর দিকে তাকায় না তবু।

বলে—আপনার এখানে যদি মাঝে মাঝে আসি কিছু মনে করবেন?

এক ঝলক হাসে বেগম।

—মনে করব আবার কি। কি যে বলেন? এত আমার সৌভাগ্য!

—আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার বেশ লাগছে। একা একা থাকি। কথা বলবার মানুষ পাই না। বোঝেনই ত'?

পোষ্টমাষ্টার ওর টানাটানা চোখের দিকে তাকায়।

বিমুগ্ধ হয়ে বলে—আমারই কি খারাপ লাগছে। তাছাড়া আমারই কথা বলবার আর তেমন মানুষ কোথায়।

ইতিমধ্যে পোষ্টমাষ্টারের স্ত্রী উঠে পড়ে।

দোরের সামনে গিয়ে স্বামীকে ডাকে—শোন।

বেগমের দিকে তাকিয়েছিল ভদ্রলোক। ডাক শুনে চমকে ওঠে।

পেছন ফিরে বলে—এখন যেতে পারব না। পরে।

—না। এক্ষুনি শোন।—খুব কড়া গলা।

বেগম খিল খিল করে হেসে ওঠে—যান না। ডাকছেন। আপনার স্ত্রী বুঝি খুব কড়া?

পোষ্টমাষ্টারের পৌরুষে ঘা লাগে—কড়া? কড়া আবার কি? ঘোড়ার ডিম।

তারপর চেঁচিয়ে বলে—যেতে পারব না এখন।

বেগম খুব একচোট হেসে নেয়।

স্ত্রীর আর সাড়া পাওয়া যায় না।

বেগম ফস্ করে বলে বসে—আপনার স্ত্রী কিন্তু দেখতে বড্ড রোগা। বিচ্ছিরি দেখায়।

পোষ্টমাষ্টার মাথা চুলকোয়—যা বলেছেন, তার ওপর আবার বছর ছয়েক আগে টাইফয়েড হয়ে একবারে কিযে ইয়ে হ'ল। একবারে ইয়ে হয়ে গেল।

বেগম হাসে।

এবারে পোষ্টমাষ্টার ওঠে—বসুন। আমি আসছি।

সন্ধ্যায় নিরঞ্জনকে চা দিতে দিতে বেগম হাসতে থাকে। কোন কথা না বলে গোড়াতেই হাসি।

—হাসছ কেন?

—ওদের স্বামী স্ত্রীতে খুব ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে এসেছি। খুব মজা হবে।

—কাদের? পোষ্টমাষ্টার মশায়ের কথা বলছ?

—তবে না ত' আর কার কথা বলছি। কি বলব তোমায়···

আবার হাসতে থাকে বেগম—যত ওর স্ত্রী ডাকে। ততই ও বলে যাব না। আর আমার মুখের দিকে ভ্যাব্‌লার মত তাকিয়ে থাকে।

নিরঞ্জন চায়ে চুমুক দেয়।

—আমার রূপ দেখে ওর আর আশ মেটে না। ওর বউটা যা চটেছে!

—ভারি মজা করেছ ত'! তুমিও বোধহয় একটু হেসেছ। গা ঘেঁসে বসেছ।

—তা নইলে কি আর কাবু করা যায় পুরুষ মানুষকে।

এবারে গম্ভীর হয়ে নিরঞ্জন বলে—ছাখত তোমার একটু অপকর্মের জন্য বেচারীদের আজ কি কষ্টে রাত কাটবে।

—আমার ত' বেশ মজা লাগছে।

—দেখ, পরকে কষ্ট দিয়ে যেমন মজা পাওয়া যায়, পরকে আনন্দ দিয়ে তার চেয়ে বেশী মজা পাওয়া যায়। একবার একটু পরখ করেই না হয় ছাখ।

—তুমি কি যে বল বুঝি না।

—কেন বুঝবে না? ওদের ভেতর ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে যে আনন্দটা পেলে। ওদের একটা ঝগড়া মিটিয়ে দিলে তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেতে। অনেক বেশী মজা পেতে। সত্যি বলছি। আমাকে বিশ্বাস কর।

—ঝগড়া আবার মেটাব কি করে?

—ওখানেও একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে, একটু হাসতে হবে, একটু মিষ্টি কথা বলতে হবে। ওই একই কায়দা। তুমি চেষ্টা

করলে পারবেই। আর সে মজা একবার পেলে তুমি মানুষের উপকার করতে পারলে আর ছাড়তে চাইবে না। আমার সঙ্গে ঝগড়া করেও লোকের ভাল করবে।

—বেশ ত' প্রথম প্রথম আমায় শিখিয়ে দাও।—বেগম যেন নিরঞ্জনের কথায় অভিভূতা হয়ে বলে। মাঝে মাঝে নিরঞ্জনের কাছেও এই রকম বশ মানে। অনেক দিন শুনতে শুনতে ওর এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, নিরঞ্জন যা বলছে, সেটা বোধহয় অনেক বড় সত্য।

—শিখিয়ে দেব। তুমি পারবে। সবাই পারে না। কিন্তু তুমি পারবে। তোমার ভেতরে অনেক ভাল জিনিষ আছে, আমি দেখতে পাই।

—ছাই দেখতে পাও।

নিরঞ্জন চা খাওয়া শেষ করে বলে—আমার সত্যি বড় খারাপ লাগছে। আমাকে কেন কষ্ট দিলে বলত'। আমাকে ত' ভালবাস। ভালবাসলে বুঝি কষ্ট দিতে হয়। ওদের আজ রাত্রের কষ্টের কথা ভেবে আমার সত্যি কষ্ট হচ্ছে।

বেগম হঠাৎ আবার আগের মত হেসে লুটিয়ে পড়ে। আগের ভাবটা ওর কেটে যায় আবার।

—তোমাকে ভালবাসি?

বলে খুব হাসতে থাকে।

—হাসছ কেন?

—হাসব না? তোমাকে ভালবাসি? একটুও নয়। এখন পর্যন্ত কাউকে আমি ভালবাসিনি। ও সব ন্যাকামি আমার আসে না।

নিরঞ্জন চুপ করে বসে থাকে।

—ভালবাসা-টালবাসা ও সব ঠিক আমি বুঝিই না।

গম্ভীর স্বরে বলে নিরঞ্জন—তবে এখানে আছ কেন?

—আছি? তোমার জন্যে নয়? নতুন জায়গায়। নতুন নতুন মানুষ আমার ভাল লাগে। নতুন নতুন মানুষকে নিয়ে গল্প করতে, হাসতে আমার মজা লাগে, তাই। সত্যি বলছি।

অতি নিষ্ঠুর সত্যকথা বলে ফেলেছে বেগম। সত্যিই তাই। ও সরলভাবে স্বীকার করেছে জীবনে নতুন নতুন পুরুষের সঙ্গে নতুন নতুন খেলায় ও মজা পায়। তাই এই নতুন জায়গায় আসা। এ ছাড়া কি কিছুই নেই?

থাকলেও সেটা এত অব্যক্ত যে স্বীকার করতে পারে না বেগম।

নিরঞ্জন চুপ করে বসে থাকে।

অনেক পরে বলে—জীবনটা কিন্তু শুধু খেলা নয় বেগম।

—তবে কি প্যাঁচার মত গম্ভীর হয়ে বসে থাকা?

—তাও নয়।

—তবে কি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিরঞ্জন—এখন বললে বুঝবে না। যখন বুঝবে তখন বলব।

—তাই বল।. এখন তোমার ওই বাজে বকবকানি আমার আমার ভাল লাগছে না।

চলে যায় নিরঞ্জন।

এমনি করেই দিনের পর দিন কাটে। বেগম প্রমত্তা হয়ে উঠছে বড় বেশী। নিরঞ্জনের গাম্ভীর্যকে গ্রাহ্যই করে না বেগম।

ও সম্পূর্ণ নিজের খুসীমত চলা ফেরা করে। খুসীমত বেড়ায়।

ডাক্তারের বাড়ীও নেমন্তন্ন হয়েছিল একদিন। গিয়েছিল। আলাপও হয়েছিল।

ডাক্তারও ওর ব্যবহারে হাসিতে এত মুগ্ধ হয়ে পড়ে যে নিরঞ্জনকে বলেই ফেলে—মশাই, ভ্যালুয়েবল্ জেম্ পেয়েছেন আপনি। সাবধানে রাখবেন। যত্ন করবেন।

নিরঞ্জন হাসে শুধু। উত্তর দেয় না।

ডাক্তারের বউটিও হাসি খুসি। চারটি সন্তানের মা। সে ছেলেপুলে নিয়েই ব্যস্ত।

বেগম মাঝে মাঝে যায় ওদের বাড়ী।

ডাক্তার হয়ত 'কলে' বের হচ্ছিল। আর বেরোন হয় না। বসে যায় গল্প করতে। লোকটা খুব আমুদে। হৈ চৈ করতে খুব ভালবাসে, আর ভালবাসে খেতে।

বেগম গেলেই হুকুম হয়—আজ মোচার চপ কর।

মোচার চপ, কুঁচো কুঁচো পাঁপড় ভাজা, চা তৈরী হয়। ডাক্তারের বউটিও খুব হাসি খুসি। খাবার তৈরী করে খাইয়ে তার খুব আনন্দ। বিশেষ করে বেগমকে ভারী ভালবাসে বউটি। নিজের ছোট বোনের মত।

চারটি সন্তানের মা হয়ে নিজেকে বড় বোনের মর্যাদায় টেনে ওঠায় বউটি। বয়েস কিন্তু বেগমের চেয়ে মাত্র কয়েক বছর বেশী।

—আর হু' খানা চপ দেব ? খাও আর হু' খানা।

বলে জোর করে খাওয়ায় বেগমকে।

বেগম হাসে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে—অসুখ হলে কিন্তু আপনি আছেন।

—নিশ্চয়ই আছি। আমি বলতে গেলে এ্যাট্ ইওর সারভিস্।

বলে হো হো করে হাসে।

—অসুখ হবে কেন। আশীর্বাদ করি কোলে একটি আসুক। বলে ডাক্তারের বউ।

বেগম খিল খিল করে হেসে ওঠে।

—কখনো নয়। দেখবেন।

ডাক্তার বলে—আপনি মা হলে কিন্তু মানাবে না।

—তাই বলে কি মা হবে না ?—ডাক্তারের বউ স্বামীর দিকে মুচকি হেসে তাকায়।

ডাক্তার বলে—সবাই ত' তোমার মত নয়। আট বছরে চারটি উপহার দিয়েছে আমায়। বুঝলেন? নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে থাকে ডাক্তার।

লোকটা বেশ প্রাণখোলা; মিশুকে।

এ গল্পে সে গল্পে রাত হয়ে যায়।

ডাক্তার ঘড়ি দেখে—না! আপনি দেখছি আমার কর্মনাশা। আপনি এলে কাজ কর্ম সব ভুলে যেতে হয়। রিয়্যালি! উঠতেই ইচ্ছে হয় না।

—নাইবা উঠলেন?

—রুগী যে মরে যাবে?

—বরং বাঁচবে। আপনারা ত' রুগী মারতেই যান।

ডাক্তার হেসে ওঠে—ইউনিক! কি শার্প কথা আপনার। ঠিকই বলেছেন। ডাক্তাররা অনেক রুগীই মারে। তবু মারতেই উঠতে হবে। না উঠলে আমি যে মরে যাব।

—কেন?

—টাকা আসবে কোত্থেকে?

ডাক্তার উঠে পড়ে। বেগম ওর বউয়ের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে তারপর ওঠে।

বাড়ী ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়।

ফিরে শোনে নিরঞ্জন একবার খোঁজ করেছিল ওর। আর কিছু বলেনি।

ছেলে পড়িয়ে নিরঞ্জন ফেরে রাত্তির সাড়ে দশটায়। এসে খেয়ে শুয়ে পড়ে। বেগমও শুয়ে পড়ে। একটা কথাও হয় না দু'জনের।

নিরঞ্জন আশা করেছিল বেগম অন্তত ওকে একবার বলবে। কোথায় গিয়েছিল ও।

কিন্তু ও দেখে অবাক হয় যে বেগম ওকে কিছুই বলে না।

নিরঞ্জন কিছুতেই পেরে উঠছে না বেগমের সঙ্গে। কোনমতে পেরে উঠছে না। মনে মনে এক একসময় অসহ্য লাগে। মুখে কিছু বলা ওর স্বভাব নয়। তাই বলে না।

পরদিন সকালে বের হবার আগে একবার নিজেই জিজ্ঞেস করে—কোথায় গিয়েছিলে ?

—কবে ?

—কাল সন্ধ্যেয় ?

—ডাক্তারের বাড়ী।

নিরঞ্জন আর কোন কথা বলে না। জামাকাপড় পরে চা খেয়ে ঘর থেকে বেরোতে যায়।

বেগম ডাকে—একটা কথা শোন ?

—কি ?—ফিরে তাকায় নিরঞ্জন। ওর কপালের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

—ডাক্তার বলছিল···। বলতে গিয়ে হেসে ফেলে বেগম।

ওটা ত' ওর অভ্যাস। নিরঞ্জন অপেক্ষা করে।

—আমাকে নাকি মা হলে মানাবে না।

বলে হাসতে থাকে।

নিরঞ্জন একটুও হাসে না। চুপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নিরঞ্জনের গম্ভীর মুখ দেখে বেগমের প্রাণটা একটু মিইয়ে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তে আবার হাসে নিজের মনে।

ও সফল হয়েছে। নিরঞ্জনের মনে জ্বালা সুরু হয়েছে। এইটেই বেগম চেয়েছিল এতকাল।

নিরঞ্জন কি জ্বলছে ?

ঠিক যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। নিরঞ্জনের গাম্ভীর্যের পেছনে জ্বালা, না চিন্তা, না ওটা নিরঞ্জনের ভান। কিছুই বুঝতে পারে না বেগম।

চুপ করে বসে থাকে।

হঠাৎ একটা লোককে ঘরে ঢুকতে দেখে ভাল করে তাকায়। কে এলো?

সদানন্দ। মাঝে মাঝেই আসে। আজও এসেছে।

সদাকে দেখলে আজকাল একটু যেন বিরক্ত হয় বেগম।

ন্যাকান্যাকা কথা বলবে। জোলো নিস্তেজ চোখদুটো মেলে তাকিয়ে থাকবে। কিছু একটা যেন প্রত্যাশা করবে। গা ঘিন ঘিন করে।

কালো মোষের মত শরীরটা ওর যেন আরও ফুলেছে। তার ওপর আবার বড় বড় বাবড়ি চুল রেখেছে। গেঁয়ো ভুত একটা। এত ঘন ঘন আসবার কি দরকার?

আর ওকে বেগমের কোন প্রয়োজন নেই। কোন দরকার নেই।

আজকাল আবার হাতে কয়েকখানা বই থাকে। আজও বই রয়েছে।

এসে ওর সামনে দাঁড়ায় সদা। সাদা ধবধবে দাঁত বার করে হাসে।

বেগম অন্য দিকে মুখ ফেরায়। গা ঘিন ঘিন করে।

—বাবা কেমন আছে?

—ভাল আছেন।

—খোকন আর মনু?

—ভালই আছে।

—মনু এলো না কেন?

—ওর যে পরীক্ষা।

বেগম এবার তাকায়। বিরক্ত হয়ে বলে—ওর পরীক্ষা তা তুই এলি কেন? পড়াতে হবে না ওকে?

চোখদুটো আর নীচু করে না সদা। আজকাল কথা বলতেও শিখেছে দু'চারটে। বলতে পারলে আর ছাড়ে না।

বলে—আমি কি না এসে পারি?

—কেন?

—কেন তা ত' জানেন। বার বার জিজ্ঞেস করেন কেন? শুনতে বুঝি ভাল লাগে?

সদা হাসে মৃদু মৃদু।

—বাঃ! বেশ মুখের ওপর কথা বলতে শিখেছিস ত'?

—আপনিই ত' শিখিয়েছেন।

বেগম উঠে পড়ে। সদার দিকে তাকিয়ে বলে—যা, কাপড় চোপড় ছেড়ে নে। উনি আসবেন খানিক্ষণ পরে। তখন কথা বলিস। ওর কাছে পড়তে এসেছিস ত'?

—শুধু পড়তে নয়।

—তবে?

—কথা আছে।

—আচ্ছা। কথা দুপুরে হবে'খন। এখন বাইরের ঘরে গিয়ে জিরো। চা জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

সদা তক্ষুনি যায় না। খাটটার দিকে একবার তাকায়। বেগমের দিকে একবার তাকায়।

—কি দেখছিস?—এবারে হেসে ফেলে বেগম।

সদা আর কথা না বলে বাইরের ঘরের দিকে চলে যায়।

ঠিক সাড়ে ন'টা নাগাদ আসে নিরঞ্জন।

বাইরের ঘরে সদাকে দেখে হেসে মিষ্টি স্বরে বলে—কখন এলে ভাই?

—একটু আগে।—সদা বলে।

—বই এনেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ। আজ সন্ধ্যেবেলা তোমাকে নিয়ে বসব পড়াতে। ওখানে সব ভাল আছে?

সদার খুব ভাল লাগে মানুষটির কথাবার্তা। বলে—হ্যাঁ। ভাল আছে।

—এসো। ভেতরে এসো। ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

হ্যাঁ।

একটু লজ্জিত হয়ে বলে নিরঞ্জন—কিছু মনে কোর না ভাই। আমাকে এখুনি বেরোতে হবে। খেয়ে নিতে হবে এখুনি। আচ্ছা। আসি কেমন? সন্ধ্যেবেলা বসব তোমার সঙ্গে।

সদা একগাল হেসে বলে—আচ্ছা।

নিরঞ্জন বেরিয়ে যায়। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর সদানন্দ বেগমের ঘরে ঢোকে পা টিপে টিপে। বেগম পানের বাটা সামনে নিয়ে বসেছিল। ওকে দেখে চমকে ওঠে।

সদানন্দ সামনে এসে চুপ করে বসে।

বেগম অভ্যাসমত একটা পান সেজে ওর হাতে দেয়—নে পান খা।

সদা পান খায়। ওঠে না। চুপ করে বসে থাকে।

বেগম কিছুক্ষণ বসে একটা হাঁই তোলে।

—বড্ড ঘুম পাচ্ছে। তুই কিছু বলবি?

সদা কি আর বলবে? ওর সমস্ত সত্ত্বা নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়েছে এই মেয়েটির করুণার কাছে। এ জীবনে ওর আর কোন চিন্তা ভাবনা কিছুই নেই। সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসে আছে বেগমের ওপর।

বেগম কি ওকে করুণা করবে না? একটু প্রাণের সুধা ঢেলে দেবে না?

সদা একটু পেলেই খুসি। আজকাল ও বেগমের কাছে এসে কিছুই পায় না। বেগমের চোখের বিরক্তিকর অবহেলার ভাবটা ও ধরতে পারে কিছুটা।

তবু ও আসে। না এসে ওর কোন উপায় নেই তাই আসে।

এক রূপসী রমণীর মোহজালের ভেতরে বন্দীজীবন কাটাচ্ছে সদা।

ও বোকা। ও ছেলেমানুষ। তাই ও বেগমকে ঠিক বুঝতে পারেনি। বেগমের অন্তরের কথা জানতে চায়নি। বেগমের কোন দোষ দেখতে চায়নি।

ও যেটুকু পেয়েছে। তাতে ওর জীবন ধন্য হয়ে গেছে বলে ও মনে করেছে।

ক্রমে আশা বেড়েছে। ও আরও কিছু চায়। আরও চায়।

কি যে চায় ও বেগমকে ভাল করে বোঝাতে পারে না। ভাল করে বোঝাবার মত বুদ্ধিমান ও নয়। তাইত নিরীহভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

—এখন যা। আমার ঘুম পেয়েছে।

বেগম আর কথা না বলে খাটের ওপর গিয়ে গড়িয়ে পড়ে।

সদানন্দ তাকিয়ে থাকে মাটির দিকে। অনেকক্ষণ।

তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের ঘরের দিকে চলে যায়।

বেগম শুয়ে শুয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলে—বিকেলে আসিস। একজায়গায় যাব।

সদানন্দ শেষ কথাটায় একটু খুসি হয়। বেগমের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বাইরের ঘরে গিয়ে ও শুয়ে পড়ে কিন্তু ঘুমোতে পারে না।

কখন বিকেল হবে সেই অপেক্ষায় মুহূর্তগুলো গোণে বসে বসে।

ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে ও টের পায় না। ঘুমের ভেতর ও এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে আজ। বেগমকে স্বপ্ন দেখে। বেগম যেন ওর ঘরে এসেছে লুকিয়ে লুকিয়ে। অন্ধকার ঘরে জ্বলছে বেগমের চোখ। চোখ দেখে ভয় হয় সদার। একি চোখ

বেগমের। চোখে ছুটো নীল আগুনের শিখা। জ্বলছে। দপ দপ করে জ্বলছে।

বেগমের সুন্দর মুখখানা যেন এক হিংস্র পশুর মত মনে হয় সদার। ও ভয় পায়। ভীষণ ভয় পায়। বেগম হাসতে হাসতে ওর বিছানার কাছে এসে বসল।

হাসিটা কি হাসি? না। হাসি ত' নয়। ধারালো ছুরি বেরোচ্ছে ওর হাসি থেকে। ঝকঝকে ছুরি অনেকগুলো। বেগে বেরোচ্ছে ওর হাসির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে।

সদানন্দ আঁতকে ওঠে। ওর বুকে এসে বিঁধে পড়ছে ছুরিগুলো। রক্তে ভেসে গেছে সদানন্দর বুক। সদানন্দ ওকে ধরতে যায় ধরতে পারে না।

আবার বুকে ছুরি এসে বিঁধে।

ভয়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠে সদানন্দ।

ঘুমটা ভেঙে যায়। তখনও সদানন্দর বুক কাঁপছে। ঘামে সর্বশরীর নেয়ে গেছে। হাত পা গুলো অবশ লাগছে তখনও।

কি বিশ্রী স্বপ্ন! কি ভয়াবহ স্বপ্ন!

উঠে বসে সদানন্দ। ঘাম মোছে। চুপ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

বাইরে তাকায়। রোদ পড়ে এসেছে। তালগাছের পাতায় পড়ে আসা রোদের শেষ রশ্মি পড়ে চিকচিক করছে। ছুটো পায়রা কি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে জানালার পাশে।

ও উঠে পড়ে। বেগমের ঘরে চলে আসে।

এসে একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে। বেগম সাজগোজ করে প্রায় তৈরী। কালোরঙের সিল্কের সাড়ীটা পরে অপূর্ব মানিয়েছে ওকে। পাউডারের কৌটোটা তখনও খোলা। চোখের কিনারায় সামান্য একটু কাজল বুলিয়ে দেয় বেগম।

তন্ময় হয়ে দেখছিল সদা।

—কিরে ? তোর এত দেরী ?

সদানন্দ লজ্জিত হয়ে হাসে।

—শিগ্‌গীর তৈরী হয়ে নে। এক জায়গায় যাব।

সদানন্দ আর তৈরী কি হবে। হাতমুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে জামাটা পরে নেয়। মুখটা ভাল করে ঘসে মুছে নেয়।

বেগমের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে।

বেগম ঘর থেকে বেরোয়। বেরিয়ে সদানন্দর হাতটা ধরে ধরেই আবার ছেড়ে দেয়—তোর হাত কি গরম রে ? চ' যাব একজায়গায়।

ওকে নিয়ে সটান চলে আসে ডাক্তারের বাড়ী।

ডাক্তার কল থেকে ফিরে একটু আগে খেয়ে দেয়ে শুয়েছিল। বেগম আসতেই উঠে পড়ে।

—আসুন। আসুন।

বেগম একটা চেয়ারে বসে। ডাক্তার উঠে এসে আর একটা চেয়ারে বসে।

—গিন্নি কই ?

—আর বলবেন না ? উপোস করে সর্বমঙ্গলার মন্দিরে গেছে। বোধহয় পূজো দিতে।

সদানন্দর দিকে তাকিয়ে বলে ডাক্তার—এটি কে ?

বেগম ফিক করে হাসে—এটি আমার পোষা—।

ডাক্তার প্রথমটায় অবাক হয়। তারপর কি একটা আন্দাজ করে নিয়ে সদানন্দকে বলে—বোস। ওই চেয়ারটায়।

এক কোণে একটা হাতল ভাঙা চেয়ার ছিল। সেইটায় চুপ করে বসে সদা।

কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না ও। এ লোকটাই বা কে ? কেনই ওকে এখানে আনল ? শুধু এটুকু লক্ষ্য করে বুঝতে পারে যে লোকটা খুসিতে উপচে পড়ছে। আর বেগম বিশেষ রকমের

তেরছা করে তাকাচ্ছে ওর দিকে বারেবারে, যেমন তাকিয়েছিল একসময় সদা কে।

সদা একটা কিছু আন্দাজ করবার চেষ্টা করে।

ডাক্তার হেসে বলে—আপনার কিন্তু চিকিৎসার দরকার।

—কেন? অসুখ আবার কবে হ'ল আমার?—হাসতে হাসতে বেগম বলে।

—ওই যে বলেছিলেন পেটে একটা ব্যথা হয় মাঝে মাঝে। ওটা কিন্তু খুব ভাল নয়।

—ও এমনি হয়।

ডাক্তার হাসে—এমনি কখনও হতে পারে। যে কোন বেদনা ব্যথা হলেই বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে।

—কে চিকিৎসা করবে শুনি?—বেগমের চোখে কৌতুক।

—কেন আমি।

—তা বেশ ত' ওযুধ দিন।

—ভাল করে দেখে শুনে ওষুধ দিতে হবে।

—রোজই ত' প্রায় দেখছেন। আবার কি দেখবেন আর।

—ডাক্তারী পরীক্ষা করতে হবে। এমনি দেখা নয়।

—ও সব আমি পারব না।

—শেষ পর্যন্ত হয়ত একটা ভীষণ অসুখে পড়বেন।

—পড়ি পড়ব।

—আর তখন—ডাক্তার হাসে—তখন আমাকেই ডাকতে হবে।

—আপনি ছাড়া বুঝি আর ডাক্তার নেই। ভারি ত' ডাক্তার আপনি!

—এ তল্লাটে আর নেই।

—সত্যি নাকি? তবে ত' বিপদের কথা।

—একজন আছেন কম্পাউণ্ডার থেকে ডাক্তার। তাদের ডাক্তার বলে না। কোয়াক বলে।

—বাব্বা! আপনি তাহলে একছত্র সম্রাট।

—তা বলতে পারেন।—প্রাণ খুলে হাসতে থাকে ডাক্তার।

বেগমও হাসিতে যোগ দেয়। ছ'জনের হাসির শব্দটা সদানন্দর কানে যেন ছুঁচ ফোটায়।

এত কথা। এত হাসি। কেন? কি জন্যে?

ডাক্তারের সবল সুন্দর চেহারার কাছে ওর নিজেকে যেন খুব ছোট মনে হয়। তাছাড়া ডাক্তার যে বেশ ভাল পয়সা রোজগার করে সেটা তার কাপড় চোপড় কথাবার্তায় বেশ বোঝা যায়।

—তবে এক কাজ করি। নিরঞ্জনবাবুকে বলি আপনার অসুখের কথা। তাঁর ইচ্ছে হলে আপনি কেমন আপত্তি করেন দেখব।

বেগম খুব একচোট হেসে নেয়—আপনাদের নিরঞ্জনবাবুকে আমি গ্রাহ্যই করি ভারি।

—গ্রাহ্য করেন না?

—একটুও না।

ডাক্তার কি যেন ভাবতে থাকে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে।

ডাক্তার গৃহিনী এসে পড়ে।

তাকে দেখেই ডাক্তার হঠাৎ হেসে বলে—উনিও গ্রাহ্য করেন না।

বউটির হাতে প্রসাদ ছিল, অবাক হয়ে বলে—আমি? কাকে?

—এই আমাকে। গ্রাহ্যি কর? বল সত্যি কথা।

—নাও কথা!—বউটি মিষ্টি হাসে—গ্রাহ্যি না করলে চলে? বলত ভাই!

বলে বেগমের দিকে তাকায়।

কথাটা যেন বেগমের ভেতর গিয়ে বিঁধে যায়।

—এই নাও প্রসাদ। খাও।

ডাক্তার হাত পেতে নেয়। সদানন্দ নেয়।

বেগম আরক্ত মুখে বলে—ও সব আমি মানি না।

ডাক্তারের বউয়ের মুখখানা সাদা হয়ে যায়—বলো কি গো! ও কথা বলতে নেই। সোয়ামী নিয়ে ঘর কর। নাও প্রসাদ ধর।

বেগম হাসে—প্রসাদ দরকার নেই আমার। একটু চা হলে বরং ভাল হ'ত।

ডাক্তার বলে—থাক না। উনি যখন মানেন না।

বউটি বিশুষ্ক মুখে আশংকা নিয়ে চলে যায়।

ডাক্তার বলে—সত্যি কথা কি জানেন? বলতে গেলে আমিও মানি না। তবে ওর মনে কষ্ট হবে তাই। তা এবারে ভাবছি আপনার মত পরিষ্কার কথাই বলব। আপনার সত্যি কথা বলবার সাহস দেখে অবাক হই মাঝে মাঝে।

সদানন্দ ঠায় বসে থাকে। ওদের আলাপের বিরাম নেই। কথার বিরাম নেই। চা আসে। খাবার আসে। ডাক্তারের বউ আসে না।

ঝি এসে দিয়ে যায়।

বেগম একবার জিজ্ঞেস করে—উনি এলেন না কেন?

ডাক্তার লজ্জিত হয়ে বলে—উপোস করে আছে। তাছাড়া ওই আপনি বলেছেন পেসাদ-টেসাদ মানেন না। ব্যস্! আপনার আর মুখ দেখবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

—বলেন কি?—বেগম খিল খিল করে হেসে ওঠে।—মুখ দেখবে না। একদিক থেকে ভালই হ'ল।

ডাক্তার বেগমের দিকে তাকিয়ে বলে—তা বোধহয় হ'ল।

রাত বাড়তে থাকে। সদানন্দ ছটফট করে। নিরঞ্জন হয়ত ওর পড়া দেখিয়ে দেবার জন্যে সন্ধ্যেবেলা অপেক্ষা করে বেরিয়ে গেছে। বেগমকে বাড়ীতে দেখেনি। তাকেও দেখেনি। নিরঞ্জন কি ভাবছে। নিরঞ্জনের কথাটা মনে হতেই সদার মনটা সংকুচিত হয়ে ওঠে। নিরঞ্জনকে সদার খুব ভাল লাগে। এত শান্ত এত

মিষ্টি ব্যবহার ও খুব কম মানুষের কাছ থেকেই পেয়েছে আজ পর্যন্ত। ও একবার ভাবে বেগমকে বলবে কিনা বাড়ী ফেরবার কথা। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারে না।

কথায় কথায় আরও অনেক রাত হয়। এইবারে ওঠে বেগম। ওঠবার আগে ডাক্তারের চোখের ওপর চোখ রেখে বলে—একটা কথা বলে যাই।

—কি ?

—আপনাকে দিয়ে ডাক্তারী পরীক্ষা করাব।

—বেশ ত'।

—কবে আসব বলুন ?

—শনিবার আসবেন—একটু ভেবে বলে ডাক্তার।

—কোথায় আসব ? এখানেই ?

—না আমার বাইরের ঘরে।

একটু হেসে বলে ডাক্তার—সেদিন আর কোন রোগীকে ডিসপেন্সারীতে ঢুকতে দেব না।

—আমার জন্যে ?

—হ্যাঁ। আপনার জন্যে।

বেগম হাসে। সদার দিকে তাকায়।

—চল সদা। রাত হয়ে গেল।

সদানন্দকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে বেগম। ওদের বাড়ী কাছেই। তবু এ সময় রাস্তাটা ফাঁকা থাকে। কোন মেয়ে মানুষ সাধারণত বেরোয় না এ সময়।

বেগম অন্যদিনও একা একা ফেরে না। ডাক্তার চাকর সঙ্গে দেয়।

আজ সঙ্গে চলে সদা। রাস্তায় একটা কথাও বলে না বেগম। নিজের মনে কি ভাবতে ভাবতে পথ চলে। সদা একটি কথাও বলে না।

বাড়ীর কাছে এসে বেগম সদানন্দর দিকে একবার তাকায়ও না। সোজা নিজের ঘরে ঢুকে যায়। সদানন্দ অন্ধকার উঠোনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বাইরের ঘরে এসে ঢোকে।

এসে দেখে নিরঞ্জন একটা ইজিচেয়ারে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে।

সদানন্দ ঘরে ঢুকতেই বলে—বেড়িয়ে এলে ?

সংকোচে সদা কোন কথা বলতে পারে না।

—কোথায় গিয়েছিলে ?

—উনি এক ডাক্তারের বাড়ী নিয়ে গেলেন।

নিরঞ্জনের মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে থাকে।

সদানন্দও চুপ করে বসে থাকে।

অনেক্ষণ পরে নিরঞ্জন বলে—চল খেতে যাই।

সদানন্দ নিরঞ্জনের পেছন পেছন বেরোয় ঘর থেকে।

দু'দিন ধরে রয়ে গেছে সদানন্দ। যাবার নামও করে না। খায় দায় বাইরের ঘরে বসে চুপ করে কি যেন ভাবে। ও আন্দাজ করতে পেরেছে। ও বুঝতে পেরেছে যে বেগম তাকে একেবারে সহ্য করতেই পারছে না। কিন্তু আজ সহ্য করতে না পারলে সদানন্দ ছাড়বে কেন ?

ওর শেষ কথা ওকে বলে যেতে হবে বেগমকে।

সদানন্দ আর এ ভাবে বাঁচতে পারছে না। প্রতিটি মুহূর্ত যেন ওর কাছে তীব্র বিষের মত জ্বালাময় হয়ে উঠছে। প্রতিটি মুহূর্তে ও নিজের কাছে নিজের বোঝা হয়ে উঠছে।

ও ছেলেমানুষ। সরল, লাজুক। সব বিলিয়ে দিয়ে ভিখিরী হয়ে বসে আছে। নিজের কোন সত্বাই আর খুঁজে পাচ্ছে না।

এ ভাবে আর চলতে পারে না। মরিয়া হয়ে উঠেছে সদানন্দ। ডাক্তারের সঙ্গে বেগমের ব্যবহারটা দেখে ও যেন বেগমকে আজ অনেকটা আন্দাজ করতে পাচ্ছে। বুঝতে পাচ্ছে। এইটে বোঝবার জন্যেই কি সেদিন ডাক্তারের বাড়ী নিয়ে গেল ওকে বেগম ?

হয়ত তাই হবে।

সদানন্দও একটা জবাব চায়। সোজা কথা শুনতে চায়। তার পর সে তার পথ বেছে নেবে।

দু'দিন পর সেদিন দুপুরে সদানন্দ বেগমের ঘরে ঢুকল। বেগম জেগে শুয়েছিল। সদানন্দ ঘরে ঢুকতেই তাকাল ওর দিকে। ভ্রূদুটো ওর কুঁচকে গেল।

তবু দাঁড়িয়ে রইল সদানন্দ।

—কি চাস তুই ? এখনও কেন রয়েছিস এখানে ?—বেগমের তিক্ত কণ্ঠস্বর ওর কানে এল। তাকাল ও।

বেগম আজ যেন বিরক্তিতে রাগে ফুলে উঠেছে।

সদানন্দ আস্তে আস্তে বললে—আমি কি চাই আপনি ত' জানেন।

হঠাৎ বেগম উঠে বসে বলে—বেরো এখান থেকে। এখনই দূর হয়ে যা।

সদানন্দ চুপ করে থাকে।

—দেখলে আমার গা জ্বলে ! দু' চক্ষে দেখতে পারি না !

সদনন্দ সমস্ত মুখখানা আগুনের মত গরম লাগছে। পেশীগুলো ফুলে উঠছে। ও তাকায়। ওর চোখদুটো রক্তবর্ণ।

বেগম ঘাবড়াবার মেয়ে নয়। বলে—ফের দাঁড়িয়ে রইলি ?

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় সদানন্দ।

একেবারে চলে যায় না। বাইরের ঘরে গিয়ে বসে থাকে। সমস্ত দুপুর আর বিকেলটা কাঠের মত বসে থাকে সদানন্দ।

বসে বসে শুধু ভাবে। কি যে ভাবে তা নিজেও বুঝতে পারে না। ওর মায়ের মুখটা মনে পড়ে আজ। মায়ের করুণ বিশুষ্ক মুখ কিন্তু চোখদুটোয় কি অপার করুণা!

—মা। মাগো! বলে এই প্রথম কেঁদে ফেলে ছেলেটা। টস্ টস্ করে জল পড়ে চোখ দিয়ে। কালো গালের ওপর চোখের জল চিকচিক করে। শুকিয়ে যায় আবার।

ও যাবে। নিরঞ্জন আসবার আগেই আর একবার যাবে। শেষকথা বলে যাবে। উঠে পড়ে বেরোয় বাইরের ঘর থেকে। নির্জন উঠোনটা পেরিয়ে বেগমের ঘরের কাছে আসে। এসেই দাঁড়িয়ে পড়ে। এ কার গলা?

নিরঞ্জনের গলা শুনতে পায়।—কি বলবে বল?

বেগম বলে—আমার হয়ে একটা কাজ করবে?

—বললুম ত' বল।

—ওই ছেলেটাকে আজই বাড়ী থেকে বার করে দাও।

নিরঞ্জন অবাক হয়ে তাকায়—কাকে?

—ওই সদাকে। জ্বালিয়ে মারলে আমায়।

—কিন্তু—।—নিরঞ্জন ইতস্তত করে।

—ওকে বলে দাও এ বাড়ী থেকে চলে যেতে। বাঁচাও আমায়।—হাঁপিয়ে উঠছে বেগম।

নিরঞ্জন গম্ভীর হয়ে যায়। বলে—কিন্তু ওর অপরাধটা কি?

—ওর অপরাধ কি? ও বদ্মাইস। ও পাজী, নচ্ছার। আমার পেছনে লেগেছে বিয়ের আগে থেকে।

—কেন?

—আমাকে ও চায়। আমার সবকিছু চায়। ওরকম মিটমিটে বদমাইস ছেলে তুমি ছ্যাখনি।

বাইরে দাঁড়িয়ে পাষাণ হয়ে গেছে সদানন্দ। ওর গালে চোখের লোনা জলের দাগ তখনও মিলিয়ে যায়নি।

—তুমি না পার; বেগমের সতেজ গলা শোনা যায়—আমি ওকে তাড়াব। ওর চুল ধরে লাথি মারতে মারতে বার করে দেব। দেখতে চাও?

নিরঞ্জন অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বলে—পাগলামি করো না। তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। ওকে তাড়াতে আমিও পারব না। তুমিও পারবে না। মিছিমিছি তুমি সন্দেহ করছ। ছেলেটিকে আমার খুব ভাল বলেই মনে হয়। যদি—

যদি বলেই থামে নিরঞ্জন।

সুগভীর শান্ত কণ্ঠে বলে—যদি ও কিছু অন্যায় করেই থাকে। সে দোষ তোমার। ওর নয়। তুমি ওর চেয়ে বয়েসে বড়। তোমার ওকে অনেক আগে সাবধান কর উচিত ছিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে সদানন্দ নিরঞ্জনের কথায় আনন্দে কেঁপে ওঠে। নিরঞ্জন কত বড়। ও কত ছোট। আর বেগম? নিরঞ্জনের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতাও ত' বেগমের নেই। আজ বেগমের পূর্ণ স্বরূপটা প্রকাশ পায় সদানন্দর কাছে।

বেগমের ক্রুদ্ধ স্বর ফেটে পড়ে—তুমিও তাহলে সদার মতই ইতর। ওকে ভাল বলছ আর আমারই দোষ দেখছ?

নিরঞ্জনের গলায় ঝাঁজ নেই—আমাকেও তাই বলে বাড়ী থেকে বার করে দেবে নাকি?

—প্রয়োজন হলে দুনিয়া থেকে বার করে দিতে পারি। তুমি আমাকে চেনো না!

নিরঞ্জন হাসে—খুব চিনি। দুনিয়াটা কত বড় সে ধারণা থাকলে তোমার ভাষা বদলে যেত। দুনিয়াটা বীরচণ্ডীপুর নয়। বনপতিপুর নয়। অনেক অনেক বড়। ভগবান করুন তোমার মনটা যেন পৃথিবীর চেয়েও বড় হয়ে ওঠে।

এ ধরণের সব কথা শুনলেই বেগম হকচকিয়ে যায়। থমকে যায়।

কথাগুলোর গভীরতা কোথায় যেন ওকে স্পর্শ করে। কিন্তু মেনে নিতে পারে না।

নিরঞ্জনের অতি শান্ত কণ্ঠ শোনা যায়—মিছিমিছি একটা বাচ্চা ছেলেকে যা নয় তাই বলছ। তাকে মেরে তাড়াতে চাইছ। গরীবের ছেলে, একটি নিরীহ ছাত্র! আচ্ছা তুমি কি! আমাকে তুমি বিরক্ত করছ বেগম।

বাইরে দাঁড়িয়ে সদানন্দ নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে বারবার প্রণাম জানায়। বার বার। ইচ্ছে হয় দুটো পায়ের স্পর্শ মাথায় নিতে। কিন্তু থাক। আজ নয়। আজ সে চলে যাচ্ছে। চলেই যাবে। আর একদিন আসবে নিরঞ্জনের কাছে। সব বলবে। বেগমের ঘরে বসে বেগমের সামনে বলবে। তারপর চলে যাবে একেবারে জন্মের মত।

পরদিন ভোরে নদীর ধারে সূর্যের সামনে দু'হাত তুলে দাঁড়াল নিরঞ্জন স্তব পাঠ করতে করতে। জবা কুসুমের মত আরক্তিম ভগবান মরিচীমালী মহাদ্যুতি বিলিয়ে দেবার জন্যে দেখা দিচ্ছেন। এই দ্যুতির তেজই জীবনের তাপ দিচ্ছে সংসারে। এ তাপ তাঁরই দান। এ সংসার তাঁরই দান। তুমি আমাকে তাপ দাও। শক্তি দাও।

আর ত পেরে উঠছে না নিরঞ্জন। আর একটু সহ্য করবার শক্তি দাও ভগবান দিবাকর।

সে যেন ভেঙে না পড়ে। মুষড়ে না পড়ে। তাকে জয়লাভ করতেই হবে কঠোর সংগ্রামে। এ কঠিন পরীক্ষায় তাকে হারলে চলবে না।

চোখ দুটো নিরঞ্জনের জ্বালা করে। কিন্তু আজ চোখ দিয়ে জল পড়ে না। চোখের জলে মনের মলিনতা আর ধুয়ে যায় না।

স্তব শেষ করে বসে পড়ে নিরঞ্জন। মাথার ভেতরটা টনটন করে। বুকে নিশ্বাস নিতে ব্যথা লাগে। কাল থেকেই শরীরটা ভাল যাচ্ছে না ওর।

বহুদিন ওর শরীর এত খারাপ হয়নি। আজ স্কুল যাবার মুখে ডাক্তারের কাছে যাবে নিরঞ্জন। বড়ই অসুস্থ মনে হচ্ছে।

ভোরে স্নান করবার পর শীত শীত করছে।

আবার তাকায় সামনে আকাশের রক্তিম প্রান্তে। বার বার প্রার্থনা জানায় আজ ওর দেবতাকে। বার বার আহ্বান করে তাঁর আলো আর তেজকে নিজের অন্তরের আসনে।

নিরঞ্জন আজ অনেক্ষণ বসে থাকে।

দিন রাত্রের মধ্যে মাত্র এইটুকু সময়ই যেন ও শান্তি পায় বলে মনে হয়।

আলো ভরে যায় যখন মাঠঘাটে। বেলা বাড়ে, তখন ওঠে ও।

দ্রুত পায়ে চলে আসে বাড়ীতে।

এসে ঘরে ঢুকে বেগমকে দেখতে পায় না। দেখতে না পাওয়াটাই ত' স্বাভাবিক। দেখতে পাওয়াটাই হঠাৎ সৌভাগ্য।

নিরঞ্জন জামা কাপড় পরে কাজে বেরিয়ে যায়।

সমস্ত দিন আজ আর ফেরে না। খায়ও না। খাবার মত শরীরের অবস্থা নয়। সর্ব শরীরে বেদনা। বিশেষ করে বুকে। নানা কাজের চাপে ডাক্তারের কাছে যাওয়াও হয় না। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফেরে।

বাড়ী ফিরে ঘরে ঢুকে বেগমকে দেখতে পায় না।

মাথার যন্ত্রণাটা ক্রমেই বাড়ছে। জ্বরও হয়েছে বেশ।

বাইরের ঘরে গিয়ে তবু ছাত্রকটিকে পড়ায়। ওদের পরীক্ষা আসছে সামনে। না পড়িয়ে উপায় নেই। পড়িয়ে এক গেলাস জল খেয়ে ভেতরে ঘরে এসে শুয়ে পড়ল।

তখনও বেগম ফেরেনি। রাত বেড়ে চলল।

নিজের হাতে চুলগুলো টানতে লাগল নিরঞ্জন। তবু মাথার যন্ত্রণা কমল না। বেড়েই চলল। রাত কি এগারোটাও বেজে গেল। এখনও বেগম ফিরল না!

সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ওর। আর সওয়া যায় না।

যন্ত্রণা চেপে তবু চুপ করে শুয়ে রইল।

বেগম ফিরল, রাত এগারোটার পর।

এসেই সটান শুয়ে পড়ল নিরঞ্জনের পাশে।

খিল খিল করে হাসতে সুরু করল।

নিরঞ্জন কথা বলল না। চুপ করেই শুয়ে রইল।

—ডাক্তারটাও এ্যাদ্দিন পরে পাগল হবার জোগাড় হচ্ছে।

নিরঞ্জন তাকায়।

—হ্যাঁ গো আমার ভেতর কি দেখে যে ওরা পাগল হয়!

যৌবন গর্বের তৃপ্তি নিয়ে ফিরেছে বেগম। আজ ওর ডাক্তারী পরীক্ষার দিন ছিল। শনিবার, আজ ডাক্তার তার ব্যক্তিত্ব বিলিয়ে দিয়েছে ওর কাছে। আজ ডাক্তারকে ও পরাজিত লাঞ্ছিত করে ফিরেছে।

নিরঞ্জন খুব আস্তে বলে—কোথায় ছিলে?

—বললুম ত' ডাক্তারের ওখানে।

—ডাক্তারকে পাগল করে লাভ কি?

—ক্ষতিই বা কি? হোক না পাগল?—খিল খিল করে হেসে ওঠে বেগম।

নিরঞ্জন ম্লান হাসে—তুমিত' জান একদিন তুমি মরবে।

—ও সব জানলেও ভাবি না।

—তখন তোমার এই দেহটাকে টেনে নিয়ে কাঠের তলায় পোড়াতে হবে।

একটু যেন চমকে ওঠে বেগম।

বলে—আমার এ দেহ আমি পোড়াতে দেব না। বলে যাব—।

—তোমাকে কতবার বলেছি, এ রূপ যৌবনের অহঙ্কারটা তোমার একেবারেই ভুয়ো। তাছাড়া আমি ত' তোমার স্বামী।

—হ্যাঁ তাতে কি হয়েছে ?

—আমার কথা এত অগ্রাহ্য কবা তোমার ঠিক নয়।

বেগম হঠাৎ রেগে উঠে দাঁড়ায়—জীবনে কাউকে কখনও গ্রাহ্য করিনি। তাছাড়া তুমি আমাকে যেটুকু ভোগ করতে পাও, সে তোমার বাপের ভাগ্যি।

নিরঞ্জন ধমকে ওঠে—চুপ কর। আমার বাবা ছিলেন সাধু। তাঁর কথা তুমি কখনও আর উচ্চারণ করো না।

বেগমের কান দুটো গরম হয়ে ওঠে—এত স্পর্ধা! তুমি জান তোমাকে আমি মানুষ বলেই ভাবি না। পোষা পাঁঠা ভেড়ার মত মনে করি।

নিরঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে আর কথা বলে না। এক প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দেয় ওর গালে।

বেগমের চোখের বাদামী মধ্যমণি জ্বলে ওঠে। লোকটার এত স্পর্ধা! বেগমকে ও চেনে না! বীরবল তালুকদারের জাঁহাবাজ মেয়ে বেগম। তাকে ওকে ও চেনে না!

সর্বশরীর ওর গলা ইস্পাতের মত গরম হয়ে ওঠে।

ও দেখাবে। প্রতিজ্ঞা করে ও মনে মনে। নিরঞ্জনকে পাঁঠার মত টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে ও। ওকে যে পাঁঠার চেয়ে বেশী মনে করে না, সেটা প্রমাণ করবে। তারপর? তারপর ভাববার কি দরকার। খুন জখম ফৌজদারী চাপা দিতে ওর বাবার সমকক্ষ এ তল্লাটে কেউ নেই। ওর বাবা আজও বেঁচে আছেন।

বেগম কাঁপতে থাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

নিরঞ্জন একটু সময় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সমস্ত রাত কেটে যায় ঘোর দুঃস্বপ্নের মত। নিরঞ্জন বাইরের ঘরে ছটফট করে কাটায় সমস্ত রাত। বুকের বেদনা বেড়ে উঠেছে। জ্বর নিশ্চয়ই খুব বেশী। মাথাটায় যেন দু'মণ বোঝা চেপে আছে। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে মাথাটা।

মাঝে দু'বার উঠে দু গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়েছে। তাতে গলার বেদনা আর বুকের বেদনা আরো বেড়ে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

বেগমের কথা ভাবতে চেষ্টা করছে দু'একবার, কিন্তু ভাববার মত অবস্থা ওর নেই, ভাবতে গেলেই মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়ে যাচ্ছে।

ও এখন আর কিছুই ভাবছে না। নিজেকে এলিয়ে দিয়ে চুপ করে পড়ে আছে।

আর ভাববার আছেই বা কি ? ও বুঝতে পাচ্ছে আর বোধ হয় বেশীদিন নয়। এ অসুখ থেকে এই পরিস্থিতিতে সেরে ওঠা ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। মৃত্যুকে কাছাকাছি দেখতে চেষ্টা করছে।

ভাবতে চেষ্টা কচ্ছে মৃত্যুকে নিতান্ত আপনার বলে।

চুপ করে পড়ে আছে নিরঞ্জন।

বেগম রাতটা ঘুমোতে পারেনি। দুঃখে নয়, বেদনায় নয়। এক অদম্য আক্রোশে ও সমস্ত রাত ফুলে ফুলে উঠেছে। নিজের সাড়ীটা টেনে খুলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে। এর প্রতিশোধ ওকে নিতেই হবে।

জীবনে কোন পুরুষ ওকে শাসন করবে, এ কথা ও ভাবতে পারে না।

নিরঞ্জন কিনা একটা চড় বসিয়ে দিলে।

মাথায় খুন চেপে গেছে বেগমের। তার গায়ে হাত দিয়ে নিরঞ্জনের বাঁচবার অধিকার নেই।

বীরবল তালুকদারের গরম রক্ত বইছে ওর ধমনীতে।

ও আরক্তিম চোখে ভাবতে ভাবতে সমস্ত রাত কাটিয়ে দেয়।

সকালে চুপ করে বসে ছিল ঘরে। হঠাৎ দেখে সদানন্দ ঘরে ঢোকে। সদানন্দ আজ এসেছে তার বোঝাপড়া শেষ করে ফেলতে। নিরঞ্জনের কাছে সব খুলে বলবে সদানন্দ। বেগমের মুখোস খুলে ধরবে আজ।

আর দেরী নয়। আজই।

বেগম সদানন্দকে দেখে লাফিয়ে উঠে পড়ে বাঘিনীর মত।

সদানন্দ ওর রক্তচক্ষু আর বিশুষ্ক মুখ দেখে ভয় পেয়ে যায়। একটু পিছিয়ে যায়।

বেগম এসে সদানন্দর হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে।

—আমি তোকেই খুঁজছিলুম সদা।

—আমাকে।

—হ্যাঁ। তোকে। আয়, ভেতরে আয়।

সদানন্দকে টেনে এনে বিছানার ওপর বসায়। দরজাটা বন্ধ করে দেয়। সদানন্দর পাশে এসে বসে অতি করুণ গলায় বলে—তুই ত' আমায় ভালবাসিস সদা! তোকে ছাড়া আর কাকে বলব।

সদানন্দ বিস্ময়ের ঘোরটা কাটাতে পারে না।

বেগম বলে—আমাকে কাল মেরেছে। জানিস আমাকে মেরেছে।

বলতে বলতে সদানন্দের কোলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে বেগম।

সদানন্দর রক্ত গরম হয়ে ওঠে। বেগমের আকর্ষণ এড়াবার মত শক্তি ওর নেই। জীবনের একমাত্র ভালবাসায় ও নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছে, তার অপমানে রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

—কে মেরেছে?

—ওই জানোয়ারটা। যার সঙ্গে তোরা আমায় বিয়ে দিলি।

সদানন্দ নিরঞ্জনের সম্বন্ধে এ রকম একটা উক্তি শুনে হঠাৎ হকচকিয়ে গিয়ে চুপ করে থাকে।

—তুই একটা কাজ করবি সদা?

—কি?

—এ জানোয়ারটাকে কেটে ফেলে দেব গঙ্গায়। তারপর তোর সঙ্গে আমি চলে যাব। তুই আমায় এখান থেকে তুলে নে সদা।

সদানন্দ চমকে ওঠে। একটি প্রশান্ত মিষ্টি অথচ গম্ভীর মুখ ওর চোখের ওপর ভেসে ওঠে। নিরঞ্জনের কথাগুলো এখনও কানে বাজে।

—তারপর?

—তারপর আমি তোর হবো।

—আমাকে কি করতে হবে?

বেগমের চোখে আগুন জ্বলে আবার। বলে—একখানা বড় দা জোগাড় করে আনতে হবে। খুব ধারালো।

সদানন্দ আবার চমকে ওঠে। বেগমের দিকে তাকায়। এক নৃশংস বাঘিনীর মত মনে হয় ওর বেগমকে। বহুকাল পরে আবার রক্তের স্বাদ পেতে চায়।

সদানন্দকে নিজের কাছে দু'হাত দিয়ে টেনে নিয়ে বলে বেগম—এ তোকে করতেই হবে।

সদানন্দর সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

ধীরে ধীরে বলে—বেশ তাই হবে। আমি একটু গভীর রাত্রে আসব। দোর খোলা থাকে যেন।

ঘর থেকে বেরোয় ও।

বেগম আশ্বাস পেয়ে যেন পরিতৃপ্ত হয়। বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে আবার।

সদানন্দ ওখান থেকে সোজা বাইরের ঘরের দিকে আসে। নিরঞ্জন কোথায় গেল? নিরঞ্জনকে একবার দেখে যেতে হবে তার। হয়ত কোথাও বেরিয়েছে।

ও অপেক্ষা করবে বাইরের ঘরে যতক্ষণ নিরঞ্জন বাবু না আসে

বাইরের ঘরের দরজাটা ঠেলে দাঁড়িয়ে ও কাঠ হয়ে যায়।

চৌকির ওপর শুয়ে নিরঞ্জন মাথাটা এপাশ ওপাশ করছে অসহ্য যন্ত্রণায়। মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। মুখদিয়ে একটু ফেনা উঠছে যেন।

সদানন্দ কাছে যায়।

—উঃ। কে?

সদানন্দ দাঁড়িয়ে থাকে।

—সদানন্দ, এসো ভাই।

কি মধুর আহ্বান! সদানন্দ ওর কপালে হাত দেয়। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে কপালটা।

—কখন এলে? জল খাবার খেয়েছ?

এই ভীষণ জ্বরেও তার আতিথেয়তার কর্তব্যে ভুল হয় না।

সদানন্দ মুখটা বাঁপাশে ফেরায়। চোখ দুটো জলে ভরে এসেছে। চোখের জল লুকোতে মুখ ফেরায়।

—তুমি আজ থাকবে?

সদানন্দ কথা বলতে পারে না। চুপ করেই বসে থাকে।

আস্তে আস্তে চোখ দুটো বোজে নিরঞ্জন।

সদানন্দ উঠে পড়ে। বেগমের কথাটা তাকে ভাল করে ভাবতে হবে। এখানে বসে এখন নিরঞ্জনের সেবা করলে কোন কাজই হবে না।

ও সোজা স্টেশনে চলে যায় সেখান থেকে। স্টেশনে গিয়ে একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে পড়ে মুখটা গুঁজে। হাজার চিন্তায় মাথাটা গুলিয়ে উঠতে চায়। গুলোলে চলবে না। আজ সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা তার।

মাথাটা ঠিক রাখতে হবে।

বেগমকে এতদিন ধরে অনেকটা চিনেছে সদানন্দ। ও রকম জেদী, একরোখা মেয়ে দেখাই যায় না। বেগম একবার যা স্থির করে, সেটা না করা পর্যন্ত স্থির হতে পারে না। বিশেষ করে হিংসায় সে যে কি না করতে পারে সেইটেই ভাববার কথা।

বেগম মনে মনে যখন নিরঞ্জনকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করেছে, তখন ওর ইচ্ছার ভীষণতম বেগকে ঠেকিয়ে রাখবার সামর্থ সদানন্দর নেই। নিরঞ্জনের ওপর একটা কোন বিরাট অন্যায় ও করবেই। নিদেন পক্ষে নিরঞ্জনকে জখম যে করবে, এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

কি করে আটকাবে সদানন্দ!

সদানন্দর মাথাটা ঝিম ঝিম করে আবার।

না দুর্বল হলে চলবে না। তাকে স্থির হতে হবে।

নিরঞ্জনের কথা মনে হতেই সদানন্দর মনটা ভিজে ওঠে। মানুষটা একা একা অসুখে পড়ে কাতরাচ্ছে। অথচ জানেও না যে আজ রাত্রে তাকে মারবার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তার নিজের স্ত্রী তাকে চরম আঘাত দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

মনে পড়ে নিরঞ্জনের কথাগুলো। বাইরে থেকে শুনেছিল—দোষ যদি থাকে ত' সে·তোমার। ও ছেলেটির নয়। ওর কোন দোষ নেই।

মাথাটা গরম হয়ে ওঠে সদানন্দর।

বেলা বেড়ে যায়। ও তেমনি চুপ করে পড়ে থাকে। একটু নড়েও না। মাথাটা গরম হয়ে ওঠে বেগমের কথা ভাবতে ভাবতে।

সদানন্দর ভালবাসাকে নির্মম ভাবে পায়ের তলায় পিষেছে বেগম। শুধু তাই নয়। তাতে এক অমানুষিক নিষ্ঠুর আনন্দ পেয়েছে। সদানন্দ ওর চিন্তায় যত তিলে তিলে জ্বলেছে। ততই আনন্দ হয়েছে বেগমের। ভাবতে গেলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

তবে কি তার কোন দোষ ছিল?

সে ত' বেগমের দিকে প্রথম তাকাতই না। ফিরেও দেখত না।

বেগম তাকে জোর করে আকর্ষণ করেছে। তারপর গ্রাস করেছে। এখন পায়ের তলায় ফেলে পিষছে।

হতভাগা ডাক্তার। ডাক্তারের অবস্থা যে সদানন্দর চেয়ে কম শোচনীয় হবে না, এ কথা হলপ করে বলতে পারে সদানন্দ। বেগমকে আজ ও পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছে। ও দেখেছে ডাক্তারের বেগমের সঙ্গে কথা বলবার ধরণ। হাসি শুনেছে। তাকানি দেখেছে। বুঝতে কিছুই বাকী ছিল না। আজ আরও বেশী করে বুঝতে পাচ্ছে।

তার মত ডাক্তারের মত হতভাগার দল বোধকরি খুব কম নেই! বেগমের জীবনে এরা পুতুলের সামিল। ইচ্ছে হলে সাজাবে, গোজাবে, আদর করবে। ইচ্ছে হলে ভেঙেও ফেলবে। কারো কোন অভিযোগ করবার উপায় নেই। বলবার উপায় নেই।

নিরঞ্জনের ওপর এত ক্ষিপ্ত হলো কেন?

কারণটাও স্পষ্টই বুঝতে পাচ্ছে সদানন্দ।

ওর লোভনীয় যৌবনের মোহবিস্তার করে নিরঞ্জনকে ও গ্রাস করে ফেলতে পারেনি। নিরঞ্জনের ব্যক্তিত্বের কাছে বার বার

পরাজয় হয়েছে ওর। তা ত' হতেই হবে। নিরঞ্জনের গভীর শান্ত স্বভাবের কাছে ত' সকলকেই হার মানতে হয়।

বেগম নিশ্চয়ই ওকে নিজের কবলে আনতে পারেনি। বেগমের ভাষায় 'পোষা' করতে পারেনি। তাই এত আক্রোশ!

শুধু তাই নয়। নিরঞ্জন হয়ত একটু শাসন করেছে। এক আধটা চড়চাপড় বসিয়েছে। একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে বেগম।

বলা যায় না এই দুর্দান্ত রাগের মাথায় একটা কিছু করে বসতেও পারে। বেগমের মত মেয়ের পক্ষে সেটা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

বিকেল গড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যে হয়ে এলো। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারদিকে। সদানন্দ উঠে পড়ে। খাওয়া দাওয়া কিছুই হ'ল না আজ। না-ইবা হ'ল। কি করে ও নিরঞ্জনকে বাঁচাবে, চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে সদানন্দ।

ওখান থেকে উঠে সোজা চলে আসে গঙ্গার ধারে।

বালির চড়ার ওপর চুপ করে বসে থাকে। ওপারে এক মন্দির থেকে নাম সংকীর্ত্তনের আওয়াজ আসছে ভেসে ভেসে। আওয়াজ ক্ষীণ থেকে আরও ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যায়।

মনটা আপনা থেকেই শান্ত হয়ে আসে। নির্জন বালির চড়ায় বসে চোখটা স্তিমিত হয়ে আসে সদানন্দর। শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে।

ওখান থেকে ওঠে এবার। রাত বোধহয় অনেক হবে।

ঘন অন্ধকার ছড়িয়ে গেছে চারদিকে। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে আসছে। রাত কত হবে কে জানে? উঠে পড়ে সদানন্দ। পথ চলতে চলতে কখন যে এসে দাঁড়ায় বাড়ীর সামনে নিজেরই খেয়াল থাকে না। ও যতবার বেগমের কথা ভাবছে, ততই যেন মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে। মাথা ঠিক রাখতে পাচ্ছে না।

বাইরের ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়।

নিরঞ্জন শুয়ে আছে তেমনি। মাঝে মাঝে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে—মাগো! মা! বলে কোঁকাচ্ছে নিরঞ্জন।

নিরঞ্জনের কাতরানির শব্দটা নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে এক করুণ কান্নার মত মনে হচ্ছে। সদানন্দ সহ্য করতে পারছে না।

মাঝে মাঝে কাতরাতে কাতরাতে বেহুঁস হয়ে পড়ছে নিরঞ্জন।

সদানন্দ উঠোনে এসে দাঁড়ায়।

বেগমের কথা মনে হতেই মাথা দিয়ে আগুন বেরুতে থাকে।

সমস্ত দিন অনাহারে আর নিরঞ্জনের অবস্থা দেখে এসে ও আর নিজের মাথা ঠিক রাখতে পাচ্ছে না।

সমস্ত পেশীগুলো ওর ফুলে ফুলে উঠছে।

ও দড়াম করে দরজাটা খুলে বেগমের ঘরে ঢোকে।

দেখে বেগম বসে আছে খাটের ওপর। বোধহয় ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল।

ঘরের স্তিমিত আলোতে বেগমের চোখ দুটো ঝকঝকিয়ে ওঠে। ও তাড়াতাড়ি নেমে এসে সদানন্দর হাতটা ধরে।

—কই এনেছিস?

খাটের ওপর বসতে যায় বেগম।

সদানন্দ ওর দু'খানা হাত বজ্রের মত কঠিন মুঠোয় চেপে ধরে।

মড় মড় করে ভেঙে যায় গালার বাহারি চুড়ি।

বেগম চমকে যায়। তাকায় সদানন্দর দিকে।

আলোটা নিভে আসছে প্রায়।

আধা অন্ধকারে সদানন্দর কালো মিশমিশে মুখখানা ভাল করে দেখা যায় না

বেগম আন্দাজে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে—হাত ছাড়।

—না।—কঠিন স্বরে বলে সদানন্দ।

—কি হ'ল তোর ?—বেগমের গলাটা কাঁপছে যেন।

—মরবার জন্যে তৈরী হও বেগম।

একি গলার স্বর সদানন্দর! মেঘের মত গর্জন করছে। হাতে কব্জির হাড় মড় মড় করে উঠছে।

সদানন্দ লোহার মত মুঠোর ভেতর ওর কব্জিদুটো ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে যেন।

—ছাড় সদা। ভীষণ লাগছে।—বেগমের গলা প্রায় কাঁদো কাঁদো।

—এরপর গলায় চাপ পড়বে। তৈরী হও বেগম।

জীবনে প্রথম বেগমের মুখ নীল হয়ে যায়। এই প্রথম ও ভয় পায়। প্রাণের ভয়।

—আমাকে মারবি ?

সদানন্দর মাথায় আগুন জ্বলছে—হ্যাঁ, নিজে হাতে মেরে গভীর রাত্রে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে জীবনের মত চলে যাব। এ দেশে আর থাকব না।

বেগম ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

—শেষকালে তুই আমাকে মারবি ?

—বাঁচবার অধিকার তোমার নেই। তুমি বাঁচলে নিরঞ্জনবাবু বাঁচবে না। তাই তোমাকেই মরতে হবে। অনেক সর্বনাশ করেছ। আর সর্বনাশ করতে আমি দেব না। শেষ নিঃশ্বাসটা বন্ধ করে দেব গলা চেপে। তৈরী হও।

হাতের কব্জি দু'খানা ছেড়ে ওর কাঁধের কাছে সদানন্দর হাত ওঠে।

ওর গলার কাছে লোহার মত শক্ত দু'খানা হাত এগিয়ে আসে। বেগমের হাত দুটো অবশ। শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। ও কিছুই ভাবতে পাচ্ছে না। কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না।

নিশ্চিত মৃত্যুর সামনাসামনি এসে ও ভেতরে ভেতরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ক্রোধ আর অহংকারের চুড়োগুলো মড়মড় করে ধ্বসে পড়ছে। এ কি হ'ল তার!

সদানন্দ এক্ষুনি টিপে ধরবে তার নরম গলাটা। তারপর কি সব শেষ হয়ে যাবে? সব শেষ?

এই রূপ, এই যৌবন, এই বাদামী চোখের মোহ, সবই শেষ!

এর কি এইটুকুই মাত্র মূল্য!

বেগম একটু নীচু হবার চেষ্টা করে।

—পালাবার চেষ্টা করো না।

পাশের ছোট আলমারিটা কাত হয়ে পড়ে যায়। শব্দ হয় কাঁচের বাসন ভাঙার।

—চুপ। একটুও শব্দ নয়।

গলার ওপর হাতের আঙ্গুলের স্পর্শ পাচ্ছে বেগম। আর একবার চেষ্টা করল ডান পাশে কাত হবার।

ঘরের আলনাটা পড়ে গেল।

সদানন্দর সর্বাঙ্গ ঘেমে গেছে। লম্বা লম্বা চুল এসে পড়েছে ঘর্মাক্ত কপালের ওপর।

ও কে ওখানে দাঁড়িয়ে? দরজার সামনে কে?

চোখ পড়তেই সদানন্দ সরে দাঁড়ায়।

বেগম বসে পড়ে ওখানেই।

ছায়ার মত টলতে টলতে ভেতরে ঢুকে আলোটা বাড়িয়ে দেয় নিরঞ্জন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে নিরঞ্জন।

—সদানন্দ তুমি!

সদানন্দ হাতদুটো জোড় করে নিরঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলে—আপনি দয়া করে এ ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

—কেন বলত?—নিরঞ্জনের গলা অতিশান্ত।

বেগমের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে সদানন্দ—ওর আর বেঁচে থাকা চলে না। কিছুতেই চলে না।

নিরঞ্জন টাল সামলায়।

বিধ্বস্ত এক প্রাসাদচূড়ার মত ভেঙে পড়ে আছে বেগম। চুল এলোমেলো। সর্বশরীরে অসীম শ্রান্তি। বেগম মুখটা তোলে। একবার তাকায় নিরঞ্জনের দিকে অতি শ্রান্ত চোখদুটো তুলে।

—ওকে বেঁচে থাকতে দেব না আমি। আর সর্বনাশ করতে দেব না।

নিরঞ্জন তাকায় সদনন্দর দিকে।

—ওর ত' কোন দোষ নেই ভাই।

সদানন্দ উত্তেজনায় কাঁপে—কি বলছেন। আজই রাত্রে ও আপনাকে মেরে ফেলত।

—আমাকে ? নিরঞ্জন পাণ্ডুর মুখে না হেসে পারে না।

বেগমের কাছে যায়। দেয়ালটা ধরে দাঁড়ায়।

—আমাকে মারবে ? আমি ত' জানি, এ অসুখে আমি বাঁচব না। তুমি শুধু চুপ করে বসে থাকলেই ত' দেখতে পাবে আমি যাব।

বেগম দুটো হাটুর ভেতর মুখ লুকোয়।

সদানন্দর উত্তেজনা আস্তে আস্তে কমে আসে। খাটের এক কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়।

নিরঞ্জন টলতে টলতে দরজার কাছে এসে বলে—সদানন্দ। আমাকে একটু ধরে ও ঘরে নিয়ে যাবে। একা যেতে গেলে হয়ত পড়ে যাব।

সদানন্দ তাড়াতাড়ি এসে ওকে ধরে আস্তে আস্তে বাইরের ঘরে নিয়ে এসে শুইয়ে দেয়।

নিরঞ্জন শুয়ে থাকে অনেক্ষণ চুপ করে। হাঁপাতে থাকে।

সদানন্দ মুখ নীচু করে বসে থাকে শিয়রের পাশে।

—সদানন্দ।

সদানন্দ চুপ করে বসে থাকে।

নিরঞ্জন বলে দম নিতে নিতে—সদানন্দ, বেগমের সত্যিই কোন দোষ নেই। ও নিজেকে নিজে জানে না, তাই এত কষ্ট পায়। ওর কষ্টে আমি বড় দুঃখ পাই ভাই।

সদানন্দর উত্তেজনা একেবারে নিভে গেছে।

ওর গলা দিয়ে একটা কথাও বেরোয় না।

—তুমি জাননা, ও আমাকে কিছুতেই মারতে পারত না!

সদানন্দর গলা ধরে আসে।

—ও আমাকে বোঝবার চেষ্টা করেছে। যেটুকু বুঝেছে, সেইটুকুই ওকে এ কাজ করতে বাধা দিত। তোমার কোন ভয় ছিল না। তুমি আমাকে বললেই পারতে?

সদানন্দ মনে মনে বার বার বলে, আমার অন্যায় হয়েছে, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি বোকা, আমি আপনাকে ভালবেসে ওকে বাধা দিতে গিয়েছিলাম। ওকে সত্যিই হয়ত মারতাম না।

কিন্তু একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরোয় না।

মূঢ়ের মত চুপ করে বসে থাকে।

নিরঞ্জন আর কথা বলতে পারে না। দম নিতে কষ্ট হয়।

—জানালাটা খুলে দাও ত' ভাই।

সদানন্দ জানালা খুলে দেয়।

—বাতাসটা কি কমে গেল। ভাল করে দম নিতে পারছি না কেন?

সদানন্দ চমকে ওঠে। নিরঞ্জন অনবরত হাঁপাচ্ছে।

—ডাক্তার ডাকব?—এই প্রথম কথা বলে সদানন্দ।

নিরঞ্জন হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—থাক কাজ নেই। একটু জল দাও।

সদানন্দ কলসী থেকে গড়িয়ে এক গেলাস জল দেয়।

—ওকে একবার ডাকবে? দুটো কথা বলবার ছিল।

সদানন্দ ভাবে বেগমকে কি করে সে ডাকতে যাবে।

—পারবে না! থাক। এখনও ওকে ক্ষমা করতে পারোনি।

সদানন্দ চুপ করে বসে থাকে।

নিরঞ্জন বলে—আবার বলছি তোমায়, ওর কোন দোষ নেই। ও নিজেকে জানে না। তাই ওর এত কষ্ট। ওকে বলো এই কথাই আমি বলে গেছি। আজ রাতটা হয়ত কাটবে না।

সদানন্দ ভয় পেয়ে যায়।

উঠে পড়ে তক্ষুনী—যাই আমি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনি। তাঁকে আমি চিনি।

বিরাট প্রাসাদের চূড়া বিধ্বস্ত হয়ে ভেঙে পড়েছে আজ। তোলপাড় হয়ে গেছে। ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিয়ে গেছে অহঙ্কারের বনস্পতিকে। শিকড় শুদ্ধু। ঝড়ের পরে বিপর্যস্ত ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়ে আছে বেগম মাটির ওপর।

বার বার কেবলই একটা অতি মধুর স্বর শুনতে পাচ্ছে—ওর কোন দোষ নেই।

বার বার একই কথা!

ঝড়ের পর অবিশ্রান্ত বর্ষণে ধুয়ে যাচ্ছে বেগম।

যতই শুনতে পাচ্ছে কাণে—ওর কোন দোষ নেই।

ততই ধুয়ে যাচ্ছে ও। চোখের অবিশ্রান্ত ধারায়।

কান্নার বেগে কাঁপতে কাঁপতে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ঠোঁটদুটো নীল হয়ে গেছে। বার বার কেঁপে উঠছে। গাল ভেসে গেল। বুক ভেসে গেল। সব যে ধুয়ে গেল আজ।

ও কি করবে? কি করবে আজ?

লজ্জায় ঘৃণায় ওর প্রতি রোমকূপ সঙ্কুচিত হচ্ছে। শরীরের প্রতিটি কণা ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে।

তবু সদানন্দ কেন ওকে মারল না?

এর চেয়ে যে মৃত্যু ভাল ছিল।

নিরঞ্জনের চোখের প্রশান্তি আর প্রাণের মাধুর্য ও এই বুকে আর কি করে ধারণ করবে? ধারণা করতে যখন পারছে, তখন ধারণ করবার শক্তি যে ও পাচ্ছে না।

ও এত দুর্বল!

বেগম কেঁদে ভেঙে পড়ে। ও দুর্বল। ও ভীতু। ও অতি ঘৃণিত।

কি করে আর ও তার কাছে যাবে। তাকে ছুঁতে গেলেও যে ওর হাত উঠবে না। তাকে ছোঁয়ার মত এক কণা শক্তিও ত' সে আজ পাচ্ছে না।

কেঁদে কেঁদে চুল ভিজে যায়। মাটি ভিজে যায়।

এর চেয়ে তাকে সদানন্দ মেরে ফেলল না কেন? বিগত দিনের অপরাধের বোঝা তাকে যে পিষে ফেলছে। তাকে আক্ষেপে বিক্ষেপে দুমড়ে মুচড়ে বিচূর্ণ করে দিচ্ছে।

আরও কি অনেককাল তাকে এইভাবে বাঁচতে হবে?

পারবে না। বেগম পারবে না। ভয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে বেগম।

রাত বেড়ে যাচ্ছে। বেগম কেঁদে কেঁদে নিঃশেষ হয়ে গেছে। বেগম কি মরে গেল? মরেই গেল বোধ হয়। চোখ মুছে যখন উঠে দাঁড়াল বেগম, তখন ওর মুখটা সাদা। চোখে দুটো ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে। নীল ঠোঁটদুটো বেগমের নয়। যেন অন্য কারো।

বেগম মরে গেছে।

আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে ও বাইরের ঘরে আসে।

দরজা দিয়ে উঁকি দেয়। নিরঞ্জনকে প্রদীপের আলোয় দেখা যায়।

শুয়ে আছে। হাঁপাচ্ছে। গলা দিয়ে কেমন একটা শব্দ বেরোচ্ছে।

আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে পায়ের কাছে যায় বেগম।

চোখদুটো বুজে আছে নিরঞ্জন।

বেগম ওর পা দুটোর ওপরে মাথাটা রেখে বসে পড়ে।

নিরঞ্জন কি জাগল ? সাড়া নেই কেন ?

অনেক চোখের জলে ভিজে ওঠে পা দুটো। বেগমের মনের এক দুয়ার ভেঙে গেছে। অপরূপ আলোয় ও ভরে ওঠে ধীরে ধীরে।

মাথাটা ওঠাতেই নিরঞ্জনের অস্পষ্ট গলা শুনতে পায়—এদিকে এসো।

বেগম শিয়রের কাছে যায়।

নিরঞ্জন দম নিতে নিতে বলে—আমি জানতাম তুমি আসবে।

বেগমের মাথায় একটা হাত রাখবার চেষ্টা করতে গিয়ে পারে না। পড়ে যেতে চায়।

বেগম ওর হাতখানা ধরে ফেলে। সযত্নে বিছানার ওপর হাতখানি রেখে কপালের ওপর হাত রাখে। কিছুক্ষণ চুপ করে কেটে যায়। রাত্রি কি শেষ হয়ে এলো ? তখনও ভোর হতে অনেক বাকী।

—দিদি !

পিছন ফিরে তাকায় বেগম।

সদানন্দ। হাতে ওষুধের শিশি নিয়ে সদানন্দ দাঁড়িয়ে আছে।

বেগম ওর কাছে এগিয়ে যায় নিঃসংকোচে। শান্ত চোখদুটো তুলে তাকায়।

—কি ভাই ?

সদানন্দর গলা ধরে আসে—ডাক্তার বাবু খানিক আগে এসেছিলেন। বললেন, ডবল নিউমোনিয়া। এই ত' গিয়ে ওষুধ নিয়ে এলুম। কি হবে দিদি ?

বেগম একটুও বিচলিত হয় না।

—কাঁদিসনে সদা, ওঁকে মরতে আমি দেব না। ওঁকে বাঁচাবার শক্তি আজ আমি ওঁর কাছ থেকেই পেয়েছি। কিছুতেই মরতে দেব না আমি।

বলতে টানাটানা চোখছুটো জলে ভরে ওঠে। প্রশান্তিতে ভরা চোখের বাদামি মণিছুটির দিকে তাকিয়ে সদানন্দ মুখ নীচু করে বলে—আমাকে ক্ষমা করো দিদি।

সদার হাত ধরে বলে বেগম—তোর দিদিকে যিনি ক্ষমা করেছেন। তিনিই তোকে ক্ষমা করবেন, দে ওষুধছুটো দে।

বলে ওষুধ হাতে নিয়ে এসে শিয়রের কাছে বসে।

তখন ভোর হতে আর বেশী বাকী নেই।

—শেষ—

